৭.১৬ ভৌতিক গহ্বর – Bangla Library

৭.১৬ ভৌতিক গহ্বর – Bangla Library

ভৌতিক গহ্বর–১০৬

ছায়ামূর্তি আশা আর জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো। তার সমস্ত দেহ আলখেল্লায় ঢাকা। মুখে মুখোশ, হাতে গ্লাবস্, পায়ে ভারী বুট! ছায়ামূর্তি আশাকে তুলে নিয়ে পাশের গুহায় প্রবেশ করলো, তারপর তাকে শুইয়ে দিলো একটা আসনে।

ফিরে এলো পুনরায় জাভেদের পাশে। জাভেদকে এবার সে কাঁধে তুলে নিলো এবং বেরিয়ে গেলো আলগোছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশার সংজ্ঞা ফিরে এলো। হাতড়ে হাতড়ে দেখলো, সে একটা চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছে। আশা সোজা হয়ে বসলো,

দৃষ্টিশক্তি তার নেই তাই সে চারদিকে তাকালেও কিছু দেখতে পেলো না।

আশা পাশে হাতড়ে ডাকলো–জাভেদ জাভেদ

কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

আশা মনে করলে তাকে জাভেদ চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে চলে গেছে অন্য কোনো গুহা বা ভূগর্ভ গহ্বরে। হয়তো অবাক হয়ে দেখছে সে। মনে পড়লো আবার সেই গুহার কথা, যে গুহায় আশা বন্দী করে রেখেছিলো বিশ বছর আগে জলদস্যু হাওন্দকে। সেই হার দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা বিকট ভ্যাপসা গ্যাস তার নাকে প্রবেশ করেছিলো, এবং সে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। ভাবলো আশা, নিশ্চয়ই জাভেদও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। এমন গ্যাস সহ্য করা কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে কি জাভেদও সংজ্ঞা হারিয়ে এখনও পড়ে আছে? না, তা কেমন করে হয়? তাহলে কে তাকে ভূতল হতে উঠিয়ে চেয়ারে বসিয়েছিলো। এ সুড়ঙ্গপথ কারও জানা নেই একমাত্র জাভেদ ছাড়া।

তবে কি জাভেদ সেই গুহায় প্রবেশ করেছে? হয়তো তাই হবে, নাহলে সে ফিরে আসতে এতক্ষণ। না জানি তার কোনো বিপদ ঘটেনি তো?

আবার ডাকলো আশা–জাভেদ জাভেদ ...জাভেদ।

কিন্তু কোনো সাড়া এলো না।

এবার আশা উঠে হাতড়ে হাতড়ে এগুতে লাগলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে তার কাঁধে কে যেন হাত রাখলো। চমকে উঠলো আশা।

প্রথমে সে মনে করলো জাভেদ, কিন্তু নিজের কাঁধের হাত খানার উপর হাত রাখতেই বুঝতে পারলো এ হাত জাভেদের নয়। তবে কে?

এমন সময় তার কানে এলো অতি পরিচিত, অতি আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর–আশা।

কে বনহুর!

হাঁ!

তুমি জীবিত আছ?

আশা, জানি তুমি বলবে না তাই আমি এলাম তোমার পাশে। আমি সবার কাছে মৃত আজ

আশা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলোনা তুমি মরতে পারোনা বনহুর! তুমি মরতে পারোনা, তুমি চিরঞ্জয়ী, তুমি অমর। একটু থেমে বললো আশা–আমি জানতাম তুমি মরোনি, তুমি বেঁচে আছো, তুমি আবার ফিরে আসবে।

তাইতো এলাম।

কিন্তু এখানে তুমি কি করে এলে বনহুর?

আমি তোমাকে অনুস্মরণ করে এখানে এসেছি আশা। তুমি আর জাভেদ যখন সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলে তখন আমি তোমার কুটিরেই ছিলাম এবং তোমাদের সঙ্গেই আমিও এসেছি এখানে।

জাভেদ কোথায়?

সে আছে এবং ভাল আছে। তার জন্য কিছু ভেবো না।

তাহলে তুমি আমাদের

হাঁ, আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি।

বনহুর আমার জীবন কাহিনীর অনেক ঘটনা আছে তোমার কাছে যা বলেছিলাম তার অপর দিক আমি জাভেদের নিকটে তুলে ধরেছি।

আশা তোমার জীবনে এমন ঘটনা থাকবে বা আছে তা আশ্চর্য কিছু নয়। আমি নিজেই তো এক বিস্ময় আশা।

কিন্তু আমি যে আমার কাছেই হেরে গেছি বনহুর।

না তুমি হারোনি, হেরেছি আমি। তোমার ভালবাসার বিনিময়ে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারিনি।

তুমি যা দিয়েছো তাই আমার জীবনে পরম পাওয়া। কিন্তু আর আমি কোনোদিন তোমাকে দেখতে পাবো না, এ যে আমার চরম শাস্তি বনহুর।

কে বললো তুমি দেখতে পাবে না?

আমি যে অন্ধ হয়ে গেছি।

তোমার দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পাবে?

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ।

তোমাকে আমি লন্ডন নিয়ে যাব। সেখানে অনেক বড় বড় ডাক্তার এবং চক্ষু চিকিৎসক আছেন। সেখানে তোমার চোখের চিকিৎসা করাবো।

কিন্তু....

কোনো কিন্তু নয়, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যই তো আমি এসেছিলাম আশা। এসে এসব দেখলাম। সত্যি আশা যা দেখছি তা বড় আশ্চর্যজনক। জলদস্যু হাওড় ঝাম জঙ্গলের গহ্বরে এমন এক সুড়ঙ্গপথ এবং সুড়ঙ্গ গহ্বরে আস্তানা গেড়েছিলো তা বিস্ময়কর বটে। ওর আবিষ্কারের তারিফ করতে হয়।

বনহুর, শুধু এই নয়, আরও ধন–রত্ন আছে যা পৃথিবীর দশ ভাগের এক ভাগ দুঃখী মানুষের অভাব মোচন করতে পারবে। একদিন আমি ছিলাম এসব ধন–রত্নের মালিক। এখন আমি এসব জাভেদের হাতে তুলে দিতে চাই।

তাতে আমার আপত্তি আছে আশা।

কেন? জাভেদ তো তোমারই সন্তান বনহুর।

তা হোক, তবু সে এখনও অবুঝ। এই ধনভান্ডার তার হাতে গেলে সে দিশেহারা হয়ে পড়বে।

বনহুর, তুমি না চিনলেও আমি জাভেদকে চিনেছি। তার মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি তোমার অস্তিত্ব। তোমারই স্বভাব ও পেয়েছে

তবু আমি চাই না সে এই ধনভান্ডারের মালিক হোক।

তাহলে তুমি গ্রহণ কর।

না, আমি তোমার এ ধনভান্ডারে হস্তক্ষেপ করবো না।

আমি তাহলে কি করবো এসব দিয়ে, আমি যে অন্ধ।

তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য জীবন দেবো আশা, কারণ তুমি আমাকে বহুবার মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছে। আশা, যতদিন না তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে ততদিন আমি শান্তি পাবো না।

জাভেদ কোথায়? তাকে তুমি কোথায় রেখে এসেছো?

তোমার কুটিরে, তোমার শয্যায় তাকে শুইয়ে রেখে এসেছ। নিশ্চিন্তে সে ঘুমাচ্ছে।

ঠিক বলছো?

হ্যাঁ।

বনহুর, তুমি ফিরে এসেছে, এযে আমার কতবড় আনন্দ তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

আশা পাবে, আমি বলছি আবার তুমি আমাকে দেখতে পাবে।

সত্যি বনহুর, তোমাকে আমি দেখতে পাবো? মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত হলেও আমি তোমাকে দেখবো। এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। কথাটা বলে আশা বনহুরের বুকে মাথা রাখলো।

বনহুর বললো–কোনোদিনই হতাশ হতে নেই আশা! জীবনমৃত্যু মানুষের সাথী, যখন যা আসবে তখন সানন্দে তা গ্রহণ করবো। যাক ওসব কথা। শোনো আশা,

এবার ঐ গহ্বরে আমি প্রবেশ করতে চাই যে গহ্বরে বিশ বছর পূর্বে তুমি আটকে রেখেছিলে জলদস্যু হাওড় ও তার সঙ্গীদের।

না, না, ও গহ্বরে তুমি যেও না। বিষাক্ত গ্যাস ঐ গহ্বরে জমা হয়ে আছে। পাথরখানা দরজা থেকে খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার নাকে এমন একটা গ্যাস প্রবেশ করেছিলো যার জন্য আমি সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম। জাভেদও সংজ্ঞা হারিয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো, আশা ঐ গহ্বরের মধ্যে কোনো জানালা দরজা না থাকায় জলদস্যু হাওড় ও তার চল্লিশ জন সঙ্গীর দেহ পাঁচ দিনের পর দিন বিষাক্ত গ্যাসে পরিণত হয়েছে। দরজার পাথর সরে যাওয়ায় অনেক হাল্কা হয়ে এসেছে গহ্বরের বিষাক্ত গ্যাস। এখন প্রবেশ করলে তেমন কিছু ভয়ের কারণ নেই।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না বনহুর?

যদি যেতে চাও চল।

বনহুর আশার হাত ধরে এগুলো।

সম্মুখে সেই ভৌতিক গহ্বর।

বনহুর আর আশা ভৌতিক গহ্বরে প্রবেশ করলো।

বনহুরের হাতে টর্চ লাইট।

টর্চের আলো ফেলে এগুতে লাগলো বনহুর আর আশা। ভিতরে প্রবেশ করেই টর্চের আলোতে বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো শুধু জমাট অন্ধকার, কিচ্ছু নজরে পড়ছে না। মুহূর্তে মাথা ঘুরে উঠলো বনহুরের–তাইতো, এমন লাগছে কেন! দুহাতে মাথাটা চেপে ধরলো বনহুর।

আশাও পড়ে যাচ্ছিলো।

বনহুর বুঝতে পেরে ধরে ফেললো আশাকে, তারপর বাইরে বেরিয়ে এলো ওকে নিয়ে।

বনহুরের মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে, সে আশাকে ধরে রাখলো শক্ত করে। ভেবে পাচ্ছে না কেন তাদের এমন হলো। তবে কি ঐ ভৌতিক গহ্বরে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। বনহুর আশাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়লো। কিছুক্ষণ সে মাথাটা দুহাতে টিপে ধরে বসে রইলো।

*

আশা একটু সুস্থ বোধ করলো, তখন সে ডাকলো–বনহুর, তুমি কোথায়? সম্মুখে হাতড়াতে লাগলো সে।

সামনে এসে দাঁড়ালো কেউ।

আশা বললো–কে?

আমি জাভেদ।

জাভেদ!

হ্যাঁ আশা আম্মু, তুমি বাপুর নাম ধরে ডাকছিলো? জানো না বাপু নেই?

জানি কিন্তু....

আশা আম্মু, আমি কি করে তোমার কুটিরে গেলাম? মানে কি করে উপরে গিয়েছিলাম আশা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

বললো জাভেদ–সত্যি তুমি কি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে?

না।

তবে?

কিছু জানি না।

আমি কেমন করে এই সুড়ঙ্গপথের বাইরে গেলাম। তুমি জানো না?

না, কারণ আমি নিজেও সংজ্ঞাহারা ছিলাম।

আশা আম্মু আমি কিভাবে সুড়ঙ্গপথের বাইরে গেছি জানি না, এমন কি তুমিও জানো না। নিশ্চয়ই কোনো গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে তোমার এই ভূগর্ভ গহ্বরে।

হয়তো তা হবে। জাভেদ আমি তোমাকে বললাম–যা তোমার প্রয়োজন সম্পদ তুমি নিতে পারো, কারণ এসব আমার। জাভেদ, আমি শুধু জলদস্যু হাওড়ের কবলেই আটক ছিলাম না, জীবনে আরও অনেক ঘটনা আছে যা তুমি জানো না। আরও একজন দস্যু আমাকে লালন–পালন করেছিলো, সে কাহিনী তোমার বাপুকে বলেছিলাম।

সত্যি আশা আম্মু, তোমার জীবন বৈচিত্রময়। যা শুনলাম তা আশ্চর্য বটে।

জাভেদ, যা প্রয়োজন তাই তুমি নিয়ে নাও।

না, আজ আমি কিছু নেবো না, যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন তোমাকে বলতে হবে না।

জাভেদ, তোমার ইচ্ছামত তুমি এসব গ্রহণ করতে পারো। একদিন আমি ছিলাম এসবের একচ্ছত্রী রাণী, আর আজ তুমি... নাও জাভেদ, তারপর চলো বেরিয়ে যাই।

জাভেদ বললো–আমি ঐ গহ্বরের ভিতর দেখতে চাই, তারপর বেরিয়ে যাবো তোমাকে নিয়ে।

কিন্তু ওর মধ্যে প্রবেশ করতে তুমি পারবে না জাভেদ। ঐ গহ্বরে ভৌতিক রহস্য লুকিয়ে আছে...

আমি তাই দেখবো।

না না, ওর মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে যেও না জাভেদ। বিপদ ওৎ পেতে আছে।

তুমি আমাকে বারণ করবে, তা আমি ভাবতে পারি না। আশা আম্মু, বাপুর রক্ত আমার শরীরে আছে, কাজেই আমি কোনো ভয়ে ভীত নই। বিপদকে আমি উপেক্ষা করি।

সাবাস জাভেদ, তোমাকে দোয়া করি যেন পিতার মতই সাহসী এবং শক্তিশালী হও।

জাভেদ কোনো কথা না বলে দ্রুত চলে গেলো এবং প্রবেশ করলো সেই ভৌতিক গহ্বরে।

আশা পেছনে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু সেই গুহার নিকটে পৌঁছতেই আশার কানে গেলো একটা আর্তচিৎকার।

চমকে উঠলো আশা এ যে জাভেদের কণ্ঠস্বর।

বুকটা ধক করে উঠলো আশার।

একটা আশঙ্কা তাকে আতঙ্কিত করে তুললো।

আশা ভুলে গেলো সব কথা। সে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করতে গেলে সেই গুহায় যে গুহায় প্রবেশ করে জাভেদ আর্তনাদ করে উঠেছে। না জানি সে কেমন আছে, জীবনে বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

আশা গুহায় পা বাড়াতেই সামনে পথ আগলে দাঁড়ালো কেউ।

হাত বাড়িয়ে অনুভব করলো–তুমি।

হাঁ আশা, আমি! এ ভৌতিক গহ্বরে যেও না, ওর মধ্যে কোনো গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে।

না না, আমাকে যেতে দাও। জাভেদ ওর মধ্যে গেছে। তার আর্তনাদ আমাকে অস্থির করে তুলেছে।

আশা, ওর যাওয়া উচিত হয়নি। জানি না ওর অবস্থা কেমন আছে, আর ওকে ফিরে পাওয়া যাবে কিনা তাই বা কে জানে।

আমাকে যেতে দাও বনহুর। আমাকে যেতে দাও। জাভেদের যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আমি বাঁচতে চাই না।

ধৈর্য ধারণ করে এখানে অপেক্ষা করো। আমি ভিতরে প্রবেশ করছি।

আশা বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বললো–আমি তোমাকে একা যেতে দেবো না বনহুর।

আশা আমি জীবিত আছি এ কথা তুমি জাভেদের কাছে যেমন চেপে গেলে তেমনি চেপে যাবে সব সময়। শুধু তুমি জানলে আমি জীবিত আছি। মনিরা, নূরী এবং আমার আস্তানার সবাই জানে আমার মৃত্যু ঘটেছে। আশা, হয়তো সত্যিই এবার আমার মৃত্যু ঘটবে। জানি না জাভেদ। জীবিত আছে কি না, ঐ গহ্বরে প্রবেশ করলে আমি ও জীবিত ফিরব কিনা কে জানে!

তাহলে তোমাকে আমি...

আশা, ভাববার সময় নেই, এমনিতেই দেরি হয়ে গেলো। যেতে দাও আশা....

আশা বললো–তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।

তা হয় না, তুমি এখানে অপেক্ষা করো। যদি ফিরে না আসি তাহলে তুমি ফিরে যেও আশা, আমি এই গভীর রহস্য উদঘাটন না করে ফিরবো না যদি জীবনে বেঁচে থাকি। কথাটা শেষ না করেই বনহুর প্রবেশ করে রহস্যময় গুহায়। প্রবেশের পূর্বে বনহুর তার মুখোশটা পরে নেয় ভালভাবে। মুখোশের সঙ্গে রয়েছে অক্সিজেন পাম্প, হাতে পাওয়ারফুল টর্চ।

বনহুর ঐ ভৌতিক গুহায় প্রবেশ করে টর্চের আলো ফেলে এগুলো। এবার মুখে মুখোশ পরে নেওয়ার জন্য বনহুর সংজ্ঞা হারালো না। টর্চের আলোতে প্রথমে কিছুই নজরে পড়লো না, শুধু জমাট অন্ধকার।

বনহুর তবুও এগুচ্ছে।

বিরাট গহ্বর।

এবার টর্চের আলোতে কিঞ্চিত আলো সৃষ্টি হলো। সেই আলোতে দেখলো বিকৃত আকার কিছু মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। কেউ বা বসে, কেউবা মাটিতে পড়ে, কেউবা দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর অবাক হলো, মৃত দেহগুলো বিকৃত হয়েছে কিন্তু পঁচে গলে মিশে যায়নি।

বনহুর দেখলে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন। টর্চের আলোতে তাকে চিনলো বনহুর। ঐ ব্যক্তিই জলদস্যু হাওড় হবে। মুখ বিকৃত, চোখ কোটরাগত, দাঁতগুলো টর্চের আলোতে ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

বনহুর স্পর্শ করলো হাওড়ের দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে পড়ে গেলো বিকৃত দেহটা। ঠিক একটা হাল্কা সোনার পুতুলের মত মনে হলে। এবার বনহুর পা দিয়ে চাপ দিলো, অমনি শুকনো ছাইয়ের মত গুড় হয়ে গেলো মৃত দেহটা।

বুঝতে পারলো বনহুর মৃতদেহগুলো পচে–গলে আবার শুকিয়ে একটা একটা হাল্কা মমিতে পরিণত হয়ে আছে। এতগুলো মৃতদেহের গলিত চর্বি এবং মাংস থেকে যে গ্যাস সৃষ্টি হয়েছে সে গ্যাস অত্যন্ত মারাত্মক।

প্রতিটি মৃতদেহই এভাবে মমি হয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর এবার জাভেদের সন্ধানে টর্চের আলো ফেলে এগুতে লাগলো।

কিন্তু কোথায় জাভেদ।

ভাগ্যিস বনহুরের মুখে মুখোশ ছিলো তাই রক্ষা, নইলে এতক্ষণ এই ভৌতিক গহ্বরে সে এমনভাবে সজ্ঞানে চলাফেরা করতে সক্ষম হতো না। বনহুর ভালভাবে সন্ধান করে চললো।

বনহুর আরষ্ট হলো, গর্তটার মধ্যে শুধু একখানা হাত নজরে পড়ছে–দেহটা কোথায়? বনহুর নিচে নেমে পড়লো, যা থাকে ভাগ্যে জাভেদকে উদ্ধার করতে হবে।

গর্তটার ভিতরে বনহুর নেমে পড়লো।

টর্চটা তার হাতের মুঠায়।

বনহুর গর্তটার মধ্যে নেমে দাঁড়াতেই তার পায়ে কিছু একটা স্পর্শ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর টর্চ জ্বেলে আলো ফেললো।

সে দেখলো গর্তটা একটা ধসে পড়া পাথরখন্ড, নিচে আরও একটা সুড়ঙ্গপথ। পাশেই পড়ে আছে সংজ্ঞাহীন জাভেদ।

বনহুর তাড়াতাড়ি জাভেদের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লো। বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখলো তার দেহে প্রাণ আছে কিনা।

একটু পরেই বনহুর আশ্বস্ত হলো।

জাভেদ মৃত্যু বরণ করেনি।

বনহুর জাভেদকে কাঁধে তুলে নিলো, তারপর অতি সাবধানে তুলে নিয়ে এলো উপরে।

আশা ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিলো।

বনহুরের পদ শব্দে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো–বনহুর, তুমি ফিরে এসেছো?

বনহুর জাভেদকে কাঁধে ঠিকভাবে ধরে নিয়ে মুখের মুখোশ খুলে ফেললো, তারপর বললো–আশা, শুধু আমিই ফিরে আসিনি, তোমার জাভেদকে ও ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।

আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো আশা।

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বনহুরের কাঁধে জাভেদকে স্পর্শ করে বললো–ও বেঁচে আছে তো?

হা আশা, ও বেঁচে আছে তবে তাড়াতাড়ি সেবাযত্নের দরকার।

তাহলে চল কুটিরে ফিরে যাই? বললো আশা।

বনহুর বললো–তাই চলো।

আশা আর বনহুর ফিরে এলো আশার ঝাম জঙ্গলস্থ কুটিরে। জাভেদকে শুইয়ে দিলো আশার শয্যায়। বনহুর নিজ হাতে জাভেদের সেবাযত্নে নিয়োজিত হলো।

আশা অন্ধ তবু সে যতটুকু পারলো জাভেদের জন্যে এগিয়ে গেলো সেবা করতে। পাশের উনানে আগুন জ্বেলে সে দুধ গরম করতে গেলে, অমনি হাতটা পুড়িয়ে ফেললো আগুনের আঁচে।

বনহুর তাড়াতাড়ি ছুটে এলো, আশার হাতখানা যত্নসহকারে হাতে তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে যন্ত্রণা দূর করবার চেষ্টা করলো।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুরের হাতের উপর আশার চোখের পানি গড়িয়ে পড়তেই বনহুর বললো– আশা, তুমি কাদছো?

তাড়াতাড়ি আশা বাম হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে ফেলে বলে–না না, কই কাঁদছি

এই তো তোমার চোখে পানি। বনহুর আশার চিবুকটা তুলে ধরে আশার গন্ড থেকে আংগুল দিয়ে চোখের পানি মুছিয়ে দেয়।

আশার অগ্নিদগ্ধের সব জ্বালা–ব্যথা মুছে যায় নিমিশে।

জাভেদ একটু নড়ে উঠলো–উঃ....একটা শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে।

বনহুর বললো–আশা, জাভেদের জ্ঞান ফিরে আসছে। আর কোনো চিন্তার কারণ নেই। আমি চললাম। আমি জীবিত আছি, এ কথা কাউকে বলবে না এটা আমার অনুরোধ।

আশা কিছু বলবার পূর্বেই বনহুর কুটির হতে বেরিয়ে যায়।

বাইরে শোনা যায় ভারী বুটের শব্দ।

আশা স্তব্ধ হয়ে ভাবে কিছু, তারপর এগিয়ে যায় জাভেদের বিছানার পাশে।

জাভেদ অস্ফুট শব্দ করে বলে–আমি কোথায়?

আশা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে–জাভেদ, তুমি আমার কুটিরেই আছো।

এমন সময় মনিয়া কিছু ফল নিয়ে হাজির হলো। আশা তাকে এই মুহূর্তে পেয়ে খুশি হলো বললো–মনিয়া বাপু এসেছো? আমাকে কিছু সাহায্য করো।

বল মাজী, কি করতে হবে? বললো মনিয়া।

আশা বললো–ঐ চুলোতে দুধ গরম হচ্ছে; গেলাসে দুধটা ঢেলে দাও বাপু।

মনিয়া ফলগুলো আশার হাতে দিয়ে ওপাশে গেলাসটা নিয়ে গরম দুধ ঢেলে ফিরে আসে আশার পাশে।

আশা গরম দুধ জাভেদকে খাইয়ে দেয়।

জাভেদ দুধ পান করে শুয়ে চোখ বন্ধ করে, কারণ এখনও তার মাথাটা বড় ঝিমঝিম করছে। গরম দুধ পান করে সে অবশ্য বেশ কিছুটা সুস্থ বোধ করছিলো।

বললো আশা–মনিয়া, তুই আমার পরম আত্নীয়ের চেয়েও বেশি। প্রতিদিন তুই দুধ না দিলে আমি বাঁচতাম না। আজ সেই দুধ পান করিয়ে তবে আমার জাভেদকে বাঁচাতে সক্ষম হলাম।

মাজী, ফলগুলো বড় টাটকা, তুই খেয়ে নে।

আচ্ছা, আমি খাবোক্ষণ। তুই যা, অনেকক্ষণ এসেছিস।

না মাজী, আমি যাবো না। ওর অসুখ আর আমি চলে যাবো? তা হবে না মাজী…আমি তোদের যত্ন করবো….

তবে কাঠগুলো রেখে তোর মাকে বলে চলে আয়।

মনিয়া চলে যায়।

আশা জাভেদের মাথাটা তুলে নেয় কোলে।

জাভেদ আশার মুখে দৃষ্টি ফেলে কিছু বলতে যায়।

আশা ওর কপালে চিবুকে হাত বুলিয়ে বলে–এখন চুপ করে ঘুমাও জাভেদ, সব বলবো।

জাভেদ ভীষণ অসুস্থ বোধ করছিলো, সে চুপ হয়ে রইলো।

*

নুর দাতে দাঁত পিষে বললো–জংলী যুবক, আমিও তোমাকে দেখে নেবো। জংলী তরুণী। ফুল্লরা আমার, তাকে তুমি কিছুতেই পাবে না।

আপন মনে পায়চারী করতে করতে কথাগুলো বলে নূর। তার মুখমন্ডলে ভীষণ একটা কুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে। গত দিনের স্মৃতিগুলো তাকে অত্যন্ত উদভ্রান্ত করে তুলেছিলো।

পুনরায় ঐ জঙ্গলে যাবে এবং তা মনে মনে সে শপথ করে নিলো।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বনহুরকে গ্রেপ্তারের পর থেকে মিঃ নূর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। তিনি আর পূর্বের মত উৎসাহ দেখিয়ে কাজে এগিয়ে আসেন না। কেমন যেন আনমনা ভাব লক্ষ্য করেছেন যখনই তারা তার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত রয়েছেন।

পুলিশমহল তাকে নিয়ে ভাবছেন কারণ উদ্দেশ্য ছিলো দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার ছাড়াও মিঃ নূরকে দিয়ে অনেক রহস্যের সমাধান তারা করতে সক্ষম হবেন।

দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারের পর থেকে নানা ধরনের জটিল সমস্যা এসে পুলিশমহলের আরাম–আয়েশকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। আজ শহরের কোনো গোপন স্থানে দুর্নীতিবাজদের আসর পুরাদমে জমে বসেছে। কাল দেখা গেলো কোনো বড় রাস্তায় লাশ পড়ে আছে হয়তো বা দেহটা মস্তকহীন। হয়তো দেখা গেলো কোনো পোড়োবাড়ির অভ্যন্তর থেকে অসহায় নারীর করুণ আর্তনাদ ভেসে আসছে।

প্রতিদিন এ ধরনের নানা রহস্যময় ঘটনা ঘটেই চলেছে। পুলিশমহল হিমসিম খেয়ে গেছে। পুলিশ প্রধানগণ হাঁপিয়ে উঠে নিজেরাই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের কর্মরত পুলিশ বাহিনীদের সঙ্গে, কিন্তু কোনো সমাধানই হচ্ছে না।

কান্দাই শহরে অন্যায় অনাচার বেড়েই চলেছে। তাই নূরের স্মরণাপন্ন হয়ে এগিয়ে যায় তারা তাকে কাজে এগিয়ে আনার জন্য। নূর এলেও পূর্বের মত গভীর

মনোযোগ দিয়ে কাজ কর্ম করে না এবং করলেও বেশিক্ষণ মনোযোগী হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে সে কর্মস্থান ত্যাগ করে। বাড়ির নির্জনতায় তাকে দেখা যায় বসে বসে ভাবতে।

কথাটা এক সময় মিমেস মরিয়ম বেগমের কানে যায় এবং কানে যায় মনিরার। তাঁরা চিন্তিত হন। তবে তাদের ধারণা পিতাকে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই সে এমন হয়ে গেছে। তাছাড়া নূরকে বেশি ব্যথিত করেছে পিতার মৃত্যু–সংবাদ।

মিসেস মরিয়ম বেগম কিছুতেই বিশ্বাস করেননি তার মনির মৃত্যুবরণ করেছে। তাঁর মন সব সময় বলেছে সে জীবিত আছে। তাই তিনি বেশি বিচলিত হননি কিন্তু মনিরা ভীষণ চিন্তিত ব্যথিত, কারণ সে বিশ্বাস করে নিয়েছে হয়তো তার স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। কারণ নূর যখন ভেঙে পড়েছে তখন তার চিন্তাটা নিশ্চয়ই সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নূর হঠাৎ এমন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যাবে এটা মনিরাও ভাবতে পারেনি।

সেদিন দুপুরে মিসেস মরিয়ম বেগম এবং মনিরা বসে বসে কিছু আলাপ আলোচনা। করছিলেন।

এমন মসয় নূর এসে হাজির হলো তার গাড়ি নিয়ে। বৃদ্ধ সরকার সাহেব নিচে ছিলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন নূরকে দেখে। নূর সরকার সাহেবের সঙ্গে কোনো কথা না বলে গাড়ি রেখে দ্রুত উপরে উঠে গেলে এবং মনিরা তাদের নরর হঠাৎ আসে না,

মরিয়ম বেগম এবং মনিরা তাদের নূরকে দেখে বিস্মিত হলো। হঠাৎ সে এ সময় হাজির হবে। ভাবতে পারেননি তারা। কারণ আজকাল নূর হঠাৎ আসে না, এলেও মাকে অথবা দাদীমাকে টেলিফোন করে তবে সে আসে। নূর এখন পূর্বের সেই ছেলেমানুষটি নেই, কাজেই তার সব কাজ অত্যন্ত ভাব গম্ভীর, এমন কি নিজের আম্মি ও দাদীর কাছেও নূর খুব সতর্ক। তার কাজে কিংবা তার কথায় কোনো সময় ছেলেমি প্রকাশ পায় না।

আজ নূরকে দেখে খুশিতে ভরে উঠলো মনিরার হৃদয়।

মরিয়ম বেগমও কম আনন্দ পাননি, তিনি বললেন–কিরে, হঠাৎ কি মনে করে?

বললো নূর–নিজের বাড়িতে আসবো তার আবার হঠাৎ বা বেহঠাৎ কি?

হাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। তুই আজকাল মস্তবড় জাদরেল ডিটেকটিভ হয়ে গেছিস কি না

তুমিও আমাকে ভয় পাও নাকি দাদী?

ওরে বাপরে ভয় পাবো না, কখন যে কি করে বসবি তার ঠিক নেই।

দাদী ও নাতীতে যখন কথাবার্তা চলছিলো তখন মনিরা চুপ চাপ শুনে যাচ্ছিলো। সে এবার বলে–যে ছেলে তার বাপকে বন্দী করে রাখতে পারে সে ছেলে সব পারবে

আম্মি, তুমি আজও চিনতে পারলে না তোমার ছেলেকে। কর্তব্যের কাছে বাপ কেন সবাইকেই আমি সমান দন্ডে দন্ডিত করতে পারি। যে যেমন অপরাধী—-

থাক আর বলতে হবে না। বল্ কেন এসেছিস। গম্ভীর কণ্ঠে বললো মনিরা।

নূর এতক্ষণে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো–কেন আম্মি, নিজের বাড়িতে আসবো তার আবার হঠাৎ অহঠাৎ কেন? জানো মা, আজ কেন এসেছি?

তা তোর আম্মি জানবে কি করে? জানলে জানবো আমি। কথাগুলো একটু হেসে বললেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা বললো–তোমরা কথা বলো, আমি যাই দেখি ওদিকে কেমন কি হচ্ছে। কথাটা বলে মনিরা বেরিয়ে গেলো রান্নাঘরের দিকে।

নূর এবার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো দাদীর পাশে।

মরিয়ম বেগম বললেন–বল কি কথা?

তুমি নাকি জানো সব?

এবার বুঝি কেউ নজরে পড়েছে?

সত্যি দাদী, তুমি মনের কথা বলতে পার।

ঐ তো বললাম আর কেউ না জানুক আমি ঠিক জানবো তোর মনের কথা। হরে কাকে পছন্দ হলো?

বলো তোমার কেমন পছন্দ? কেমন মেয়ে তুমি চাও?

বলবো?

বলো?

আমার কথা মত তুই বিয়ে করবি?

দেখি বলোই না।

মরিয়ম বেগম বলতে শুরু করলেন–বৌয়ের গায়ের রং হবে দুধে আলতা মেশানন। চুল হবে মেঘের মত কালো, চোখ হবে পটলচেরা। দাঁত হবে মুক্তার মত

আর তার হাসি হবে কেমন? মধুর মত মিষ্টি আর কণ্ঠস্বর হবে বাঁশির সুরের মত

চুপ কর বলছি।

আর বলতে হবে না। দাদী আম্মি, তোমার কথার সঙ্গে একটিও মিলবে না। আমি পছন্দ করেছি এক জংলী মেয়েকে

নূর!

হাঁ দাদী আম্মি।

জংলী মেয়ে সে আবার কেমন?

জংলী মেয়ে যেমন হয় তেমনি তবে তোমার বর্ণনার সাথে মিল নেই।

এমন একটা মেয়ে তুই পছন্দ করলি?

জানিনা কেন ঐ মেয়েটা আমার এত ভাল লেগেছে।

এই বয়েসে যা দেখবি তাই ভাল লাগবে। এটা তোর দোষ নয়, বয়সের দোষ।

দাদী আম্মি, আমার বড় সাধ ঐ জংলী মেয়েটাকে আমি বিয়ে করবো।

কোথায় কেমন করে তুই জংলীমেয়ের খপ্পরে পড়লি।

কান্দাই জঙ্গলে।

নিশ্চয়ই কোনো ডাইনি মেয়ে হবে।

না দাদী, মোটেই ডাইনি নয় তবে—

বল থামলি কেন?

নাগিনী বলা যায়

তার মানে?

মানে নিকটে গেলে ছোবল মারতে চায়।

সর্বনাশ, এমন মেয়ের ধারেও যেতে নেই।

কিন্তু

ওকে ভালবেসে ফেলেছিস?

হাঁ দাদী আম্মি।

তোর আম্মি কেঁদে কেঁদে পাগলপ্রায়। একথা শুনলে মাথা ঠুকে মরবে।

দাদী তুমি সহায়।

ও কথা আমি তাকে বলতে পারবো না।

তাই তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু–বড় ভয় হয়।

তাই বুঝি পায়তারা করে তোর মাকে—

হাঁ, ঐ ভাবে কিছুটা আঁচ দিতে চাচ্ছিলাম।

নূর, পাগলামি করবি না।

দাদী, তুমিও বিরোধিতা করছো?

জানিস নুর তুই কোন ঘরের ছেলে। তা ছাড়া তুই একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ

তাইতো আমি বৈচিত্রময় জীবন ভালবাসি। দাদী যা বলো মেয়েটাকে তুমি যদি একবার দেখতে।

একটা জংলী মেয়েকে তুই ঘরের বৌ করে আনতে চাস এত দুঃসাহস তোর।

দাদী, তুমি শুধু আম্মির মত করবে আর সব ঝামেলা আমার।

জানি না, আমি কিছু জানি না। ভেবেছিলাম আদর্শ এক মেয়েকে তুই পছন্দ করেছিস।

কিন্তু তেমন মেয়ে আমি চাই না দাদী।

নুর একটা জংলী মেয়েকে তুই পছন্দ করলি?

এমন সময় মনিরা ট্রের উপরে নানা ধরনের নাস্তা সাজিয়ে নিজ হাতে নিয়ে হাজির হলো। ছেলে এসেছে তাও বেশ কয়েকদিন পর, তাই মনিরা নিজ হাতে নাস্তা তৈরি করে নিয়ে এসেছে। এ শিক্ষা মনিরা পেয়েছে তার শ্বাশুড়ির কাছে। বাসায় ঝি চাকর দাস–দাসী বাবুর্চির অভাব নেই। তবুও নিজ হাতে রান্না করা চৌধুরীবাড়ির মেয়েদের অভ্যাস। মনিরা আধুনিক মহিলা তবুও একাজ সে করে।

নাস্তার ট্রে হাতে নিয়ে প্রবেশ করতেই মনিরার কানে যায় শ্বাশুড়ির কথাগুলোর শেষ অংশ।

মাকে দেখেই নূর দাদীর মুখে হাতচাপা দিয়ে তার বলবার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে দিয়েছিলো।

মরিয়ম বেগমও বাধ্য হয়ে চুপ হয়ে গেলেন।

নূর মায়ের হাত থেকে নাস্তার ট্রে নিয়ে টেবিলে রাখতে রাখতে বললো–আম্মি, আমি তো খেয়েই এসেছি তবু এত সব করতে গেলে কেন?

মরিয়ম বেগম বললেন–মায়ের মন তুই কি করে বুঝবি। বাক্যব্যয় না করে খেয়ে নে লক্ষী ছেলের মতো।

তা খাচ্ছি। কথাটা বলে খেতে শুরু করে নূর। কিছু মুখে দিয়ে বলে–দাদী, তুমি খাবেনা? নাও একটু খাও।

নারে পাগল আমি খাবো না।

তোমাকে খেতেই হবে। নাও হা করে দেখি।

অগত্যা খেতে হলো মরিয়ম বেগমকে।

মনিরা ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। শাশুড়ির কথাটা তার কানে বাজছিলো, একটা জংলী মেয়েকে তুই পছন্দ করলি–একি শুনলো সে। তবে কি সত্যি কোন ঘটনা ঘটেছে তার জীবনে। নূর কি কোনো জংলী মেয়ের পাল্লায় পড়েছে না না, নূর তেমন ছেলে নয়।

মনিরাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুললো কথাগুলো। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।

নূর এক সময় বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

মনিরা এসে দাঁড়ালো শ্বাশুড়ির পাশে।

মরিয়ম বেগম বৌমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা বুঝেছিলো। নিশ্চয়ই সে কিছু শুনেছে। বললেন তিনি– বৌমা, কিছু বলবে?

মনিরা বললো–নুর কেন এসেছিলো মামীমা?

কেন মায়ের কাছে ছেলে আসবে তা আবার কেন আসবে তার জবাব নাকি বৌমা।

আমি শুনলাম তুমি কি যেন বলছিলে মামীমা?

ও কিছু না।

আমার কাছে লুকোতে চেওনা মামীমা। কেন এসেছিলো?

কেন, আমাকে তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে নাকি?

মামীমা, তোমাকে আমি অবিশ্বাস করতে যাবো কেন? আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি সে তোমাকে কি বললো?

সব বলছি বৌমা। চলো, ঘরে চলো। মরিয়ম বেগম মনিরাসহ ঘরে আসেন। মনিরাকে পাশে বসিয়ে দিয়ে বলেন তোমার ছেলে বিয়ে করতে চায়।

বেশ তো ভাল কথা।

তবে

থামলে কেন বলো?

একটা জংলী মেয়েকে সে পছন্দ করেছে।

তুমি না বললেও আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম।

কি করে বুঝলে বৌমা?

নাস্তার ট্রে নিয়ে যখন ঘরে প্রবেশ করছিলাম তখন শুনলাম তুমি বলছিলো, তুই একটা জংলী। মেয়েকে পছন্দ করলি তখনই আমার বুকটা ধক করে উঠেছিলো।

হাঁ বৌমা, সত্যি সে কোনো এক জংলী মেয়েকে পছন্দ করেছে।

আর তুমি তাকে প্রশ্রয় দিলে মামীমা?

আমি ওকে প্রশ্রয় দেবো, এ কথা তুমি ভাবতে পারলে? ওকে বারণ করেছি এমন ভুল যেন সে না করে।

এবার বুঝেছি হঠাৎ এবাবে ছুটে এসেছে কেন? তুমি যাই বলো মামীমা, আমি ওকে এ বাড়িমুখো হতে দেবো না। চিরদিন ওর বাবা আমাকে জ্বালিয়ে মারলো; আবার ও আমাকে এভাবে জ্বালাবে। না, কিছুতেই আমি বরদাস্ত করবো না।

কথাগুলো বলে চলে গেলো মনিরা নিজের ঘরে।

মরিয়ম বেগম চিন্তিত মুখে বসে রইলেন।

*

নুরের গাড়ি ফটকে পৌঁছতেই গেটম্যান দরজা খুলে দিলো।

নূর গাড়িসহ ভিতরে প্রবেশ করলো।

গেটম্যান সালাম ঠুকে সরে দাঁড়ালো একপাশে।

গাড়ি প্রবেশ করলে গেট বন্ধ করে দিলো গেটম্যান।

মুখে চাপ দাড়ি, মাথায় পাগড়ি পাঠান পাহারাদার বা গেটম্যানটা বড় ভাল লোক। নূর ওকে সমীহ করে, কারণ ওর মধ্যে বিরাট একটা দায়িত্বোধ ভাব লক্ষ্য করেছে সে। তা ছাড়াও পাঠান পাহারাদারটার বলিস্ট চেহারা তাকে আকৃষ্ট করেছে। গেটম্যান শুধু প্রহরী বা দারোয়ানের কাজ করে না, সে ড্রাইভিং জানে ভালো।

চাকরিটা দিয়েছে নূর তাকে নানাদিক চিন্তা করে। বড় ভাল এবং বিশ্বাসী সে।

নূর অন্তপুরে পৌঁছানোর পর আর একখানা গাড়ি এসে ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে হর্ন দিলো।

গেটম্যান গেট খুলে সরে দাঁড়ালো।

গাড়ি চলে গেলো ভিতরে।

একেবারে সোজা গাড়ি–বারান্দায় রেখে দুজন ব্যক্তি নেমে সিঁড়ির দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো।

সিঁড়ির পাশে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো দারোয়ান। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো– কাকে চান?

বললো একজন—-তোমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দারোয়ান বললো–সাহেব এইমাত্র এলেন, আপনারা বসুন। আমি সাহেবকে খবর দিচ্ছি।

না, খবর দিতে হবে না বরং তুমি বসে আরাম করো। কথাটা বলেই তারা দারোয়ানকে ধরে মজবুত করে বেধে ফেললো, তারপর সিঁড়ির নিচে ওকে শুইয়ে দিয়ে উঠে গেলো সিঁড়ি বেয়ে উপরে।

নূর কক্ষে প্রবেশ করে সবে মাত্র গা থেকে জামাটা খুলে ফেলেছিলো।

এমন সময় আগন্তুক দুজন সেই কক্ষে প্রবেশ করে পেছন থেকে নূরের মুখ ও গলা টিপে ধরে। একটা রুমাল দিয়ে নূরের মুখ চেপে ধরলো তারা।

সঙ্গে সঙ্গে নূর সংজ্ঞা হারিয়ে লোক দুটোর হাতের উপর এলিয়ে পড়লো। কারণ রুমালে ক্লোরফরম মেশানো ছিলো।

লোক দুজন এবার নূরের সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে নিয়ে নেমে এলো। নিচে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো ছিলো, ওরা দুজন নূরের সংজ্ঞাহীন দেহটা গাড়িতে তুলে নিয়ে স্টার্ট দিলো। কিন্তু ফটকে এসে অবাক হলো লোক দুজন, গেটম্যান গেটে নাই, ফটক খোলা।

লোক দুজন নূরের সংজ্ঞাহীন দেহটা পেছন আসনে শুইয়ে দিয়ে একজন ড্রাইভিং আসনের অপরজন ড্রাইভিং আসনের পাশের আসনে বসেছিলো। তার হাতে ছিলো পিস্তল, কারণ গেটম্যান বাধা দিলে তাকে চলন্ত গাড়ি থেকে হত্যা করবে, তারপর গন্তব্য স্থানের দিকে চলে যাবে।

কিন্তু কেউ তাদের বাধা দিলো না।

বরং গেটম্যান ফটক খুলে রেখে সরে পড়েছে।

হাসলো একজন। অপরজনকে লক্ষ্য করে বললো–বেটা ভেগেছে।

ভালই হলো, কেউ বাধা দিতে এলো না।

রাতের অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে।

রাজপথের দুপাশে লাইটপোষ্টগুলো তারার মালার মত জ্বলে উঠেছে।

গাড়ির ভিতরে আলো প্রবেশ করছিলো তবে বাইরে থেকে কিছু নজরে পড়ছিলো না। গাড়িখানা ছিলো একটু ভিন্ন ধরনের। কতকটা মাইক্রোবাসের মতো।

নূরকে যে আসনে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শুইয়ে রাখা হয়েছে তার পিছনে আর ও একটা আসন শূন্য পড়ে আছে।

গাড়ি ছুটছে।

গন্তব্য স্থান কোথায় শুধু তারাই জানে।

একটা বড় হোটেলের পেছন অংশে এসে গাড়িখানা থামলো। লোকজন নেমে দাঁড়ালো এবং নূরের সংজ্ঞাহীন দেহটা গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে বললো একজন–এত সহজে কাজ হাসিল হবে ভাবতে পারিনি।

অপরজন বললো–আমি জানতাম আজকাল মিঃ নুরুজ্জামান চৌধুরী বড় অসাবধানে থাকে, কারণ তার জীবনে নাকি কোনো বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে

যাক ওসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। মালিক যা বলেন তাই হবে।

পুরষ্কার মোটা মিলবে।

তা মিলবে কিন্তু পুরস্কারের চেয়েও আমাদের বড় লাভ হলো আমরা এখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবো। কারণ প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নূরুজ্জামান চৌধুরী আমাদের হাতের মুঠোয়।

চল বড় দেরী হচ্ছে, কেউ এসে পড়বে।

এমন একটা কাজ আমরা দুজন করেছি কেউ ভাবতে পারবে না। বাহাদুর আমরা।

ওরা দুজন নূরের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চললো।

লোক দুজন নূরের দেহটা যখন গাড়ি থেকে নামিয়ে নিচ্ছিলো তখন নূর একটু শব্দ করলো।

অমনি দ্বিতীয় ব্যক্তি পূর্বের রুমালখানা পকেট থেকে বের করে নূরের নাকে চেপে ধরলো।

নূর পুনরায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো।

হোটেল বাড়ির পেছন দিয়ে একটা লম্বা টানা পথ চলে গেছে ভেতরে। সেই পথে ওরা নূরকে নিয়ে একটা কক্ষে প্রবেশ করলো।

কক্ষে বৃহৎ আকার সোফায় বসে আছে এক বিশালদেহী জমকালো পুরুষ। মুখে একমুখ দাড়ি, লাল টকটকে চোখ, দাঁতগুলো পানের রসে অথবা কোনো নেশা জাতীয় পদার্থের দ্বারা জারুল রং হয়ে উঠেছে। দেহের পোশাক অত্যন্ত দামী।

লোকটার সামনে নূরকে শুইয়ে দেওয়া হলো।

লোকটা হোটেলের মালিক হবে–তার চেহারা এবং পোশাক পরিচ্ছদ প্রমাণ করেছে তার পরিচয়।

বললো সে লোক দুজনকে–সাবাস্ তোমরা এত সহজে এত কঠিন কাজ সমাধা করেছে। যাক এক একজন তোমরা দুহাজার টাকা পুরস্কারের পরিবর্তে পাঁচ হাজার টাকা করে পুরস্কার পাবে।

মালিক, আপনার হুকুম আমরা রক্ষা করতে পেরেছি, এই আমাদের বড় সৌভাগ্য।

নাও টাকা নাও, কারণ এখনও আরও কাজ তোমাদের বাকি আছে।

হুকুম করুন মালিক? বললো প্রথম ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি মাথা চুলকে তাকালো মালিকের মুখের দিকে।

বললো মালিক–দস্যু বনহুর বন্দী হবার পর থেকে

না হুজুর, বন্দী নয়–নিহত হবার পর থেকে বলুন।

হাঁ, ঠিক বলছো। দস্যু বনহুর নিহত হবার পর থেকে আমরা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি। কেউ নেই আমাদের কাজে বাধা দেয়ার।

তবে মালিক–পুলিশ মহল মাঝে মাঝে....

হাঁ, ওরা কিছুটা জ্বালাতন করে কিন্তু তারাও আমার কাছে কাবু, কারণ দেশের যারা নেতা মানে নেতৃস্থানীয় তারা আমার সাথী মানে পার্টনার। আমি....

মালিক, আপনি নিজেও তো কান্দাই শহরের একজন স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ। আপনাকে দেশের কে না চেনে।

হাঁ, তা ঠিক, একবাক্যে সবাই চেনে মাওলানা নিজাম রেয়াজিকে তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

একেবারে খাঁটি কথা মালিক। তবে আপনার কাজের কথা অনেকেই জানে না, মানে আপনার ব্যবসার কথা। মানে...আপনার শুধু হোটেলই নয়, আরও যে কিছু ব্যবসা আছে।

চুপ করো, দেয়ালেরও কান আছে।

মালিক, কান্দাই সরকার আপনাকে মন্ত্রির পদে বহাল করেছেন।

চুপ করো আমি যখন আমার ব্যবস্থাস্থলে আসি তখন আমি মন্ত্রি নই আমি তখন মালিক নিজাম রেয়াজি। আর যখন জনসাধারণের সামনে হাজির হই তখন মাওলানা নিজাম রেয়াজি। সরকারি ভবন পেয়েছি–দারোগা, পুলিশ থেকে শুরু করে সেক্রেটারী সব পেয়েছি।

মালিক, আপনার চেহারাটাও আউলিয়াদের মত মানে মাওলাদের মত।

তবে কি আমি নামাজী নই তোরা বলতে চাস?

মালিক, তওবা তওবা, আপনার মত নামাজী বুঝি দুনিয়ায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। আহা যখন আপনি নামাজ আদায় করেন তখন আপনার কণ্ঠস্বর সিংহ গর্জনের মত শোনায়।

সাবধানে কথা বলবি, বুঝলি? আমি শুধু হোটেল মালিক অথবা ব্যবসায়ী নই, আমি হলাম কিনা....থাক ওসব কথা।

নূরের সংজ্ঞাহীন দেহটা একটু নড়ে উঠলো।

নিজাম রেয়াজি বলে উঠলো–শোন ওকে নিয়ে যা...

মালিক, নিয়ে যাবো?

হাঁ, নিয়ে যা। ভাল করে আটক রাখবি। তারপর রাতে ফিরে ব্যবস্থা করবো।

মালিক এখন কোথায় যাবেন? বললো একজন।

মালিক বললেন–জানোনা এখন আমাদের দরবার চলছে?

কিসের দরবার এত রাতে?

ও তোরা বুঝবি না।

মালিক, আমরা আপনাদের কর্মচারী, আমাদের কাছে কিছু লুকোবেন না। বললো প্রথম ব্যক্তি।

মালিক বললো–বলছিতো দেয়ালেরও কান আছে।

কিন্তু মালিক, আমরা সব জানি।

বেশ, বেশ তোমরা জানবে না তো কারা জানবে। তোমরা হলে আমার বিশ্বস্ত কর্মী ভাই। যাও আর বিলম্ব করো না, চলে যাও। দেখো ওকে সাবধানে গুমঘরে আটকে রাখবে যেন কেউ টের না পায়। কিন্তু কান্দাই সরকারের লোক...

মালিক, আপনিও তো সরকারের

লোক শুধু নই, আমরাই সরকার, বুঝলে?

তা আর বুঝবো না মালিক।

হাঁ, এবার যাও। বলে উঠে পড়লেন বিশাল বপুধারী মাওলানা নিজাম রেয়াজি।

হোটেলের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসেন।

ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চললো।

বিরাট একটা বাড়ি, এটা সরকারি প্রাসাদ। বাড়ির ফটকে অস্ত্রধারী পুলিশপ্রহরী। কান্দাই সরকারের জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান বাড়ির সামনে উঠানে। চারপাশে গ্যালারী করা বাগান। আহা, কি চমৎকার ব্যবস্থা সরকারের এমন না হলে হয়।

বাড়ির সামনে ভাগে এবং বাড়ির অফিস রুমে অপেক্ষা করছেন দেশদরদী বন্ধুরা। তারা এসেছেন মন্ত্রিবাহাদুরের কাছে দেশ গড়ার কাজের মত পরামর্শ এবং কিছু মহৎ কর্মের লাইসেন্সের জন্য।

মন্ত্রি সাহেবের জন্য এসব দেশদরদী বন্ধুরা জান পানি করে খেটেছেন। তাই তারা সময়কাল স্মরণ না রেখে মহান দেশরক্ষক মন্ত্রিবাহাদুরের কাছে নানা ধরনের দাবি নিয়ে হাজির হন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন প্রহরের পর প্রহর কাল ধরে।

মাওলানা নিজাম রেয়াজির গাড়ি যদিও বেশ রাতে এসে ভিড়লো বাড়ির উঠানে তবুও দেশপ্রেমিক ভাইরা মোটেই ক্লান্ত পেরেশান না হয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে এসে ঘিরে ধরেন গাড়িখানা।

মহান পুরুষ গাড়ি থেকে নামলেন।

দেশপ্রেমিক ভাইরা তাড়াহুড়ো করে হাত বাড়ালেন কে আগে মন্ত্রিবাহাদুরের সঙ্গে করমর্দন করে নিজেদের প্রমাণ করবেন আমি আপনার অনুগত দাস।

মন্ত্রিবাহাদুর রাশিকৃত পানের জাবর কাটতে কাটতে গাড়ি থেকে নেমে যতদূর পারলেন হাতে হাতে মিলালেন দেশসেবক কর্মী ভাইদের সঙ্গে।

ঘর্মাক্ত কলেবরে মন্ত্রিমহোদয় এগিয়ে চললেন গাড়ি থেকে নেমে।

তার চারপাশে ঘিরে এগুচ্ছেন দেশপ্রেমিক ভাইরা।

মাওলানা নিজাম রেয়াজি হাতঘড়ি দেখলেন, ওঃ বড় রাত হয়ে গেছে, নামাযটা আদায় করে। নিতে হয়।

দেশপ্রেমিক বন্ধুরা সায় দেন–হাঁ, চলুন মন্ত্রিসাহেব, আমরাও এবাদত করে নিই।

এসো তোমরা। মন্ত্রি সাহেব বিশাল বপু নিয়ে অন্তপুরের দিকে এগুলেন।

একসঙ্গে এবাদত চললো, তারপর এসে বসলেন অফিসকক্ষে।

চললো নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কাজের আলোচনা। আহা, বড় দেশদরদী বন্ধু নিজাম রেয়াজি। ললাটে এবাদতের চিহ্ন তার নিষ্ঠায় প্রমাণ।

রাত বাড়লো।

বিদায় নিলেন দেশপ্রেমিক বন্ধুরা।

মন্ত্রিবাহাদুর হাই তুলে ডাকলেন–কইরে, টেবিলে খানা লাগা।

খানা শেষ করে পানের বাটা টেনে নিলেন মাওলানা নিজাম রেয়াজি। পাশেই তাঁর টেলিফোন। রিসিভার তুলে নিলেন হাতে। চললো আলাপ–আলোচনা। তার গোপন ব্যবসা নিয়ে হচ্ছে কথোপকথন। কোন্ মাল কি ভাবে কোন পথে কোথায় যাবে এবং টাকা–পয়সা কত লেন দেন হবে সব হলো ফোনে।

তারপর মন্ত্রিবাহাদুর পুনরায় একখিলি পান তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে শয্যায় এসে বসলেন। বিশাল বপু তাই জামা পরে শোয়া তার পক্ষে বড় যাতনাকর। জামাটা খুলে ছুঁড়ে মারলেন আলনার দিকে।

পরিবার পরিজন রাখেন না সরকারি ভবনে, দেশপ্রেমিক মাওলানা সাহেব এমন অন্যায় করতে রাজি নন। দেশের বাড়িতে থাকেন স্ত্রী কন্যা পরিবার পরিজন। বড় ভাল মানুষ তিনি। মাসে একবার দুবার দেশে যান সরকারি বাহনে কিন্তু তাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে চান না নিজের কাজে, কারণ এটা অন্যায়। এ কারণে সরকারি কাজে তারিখ করে নেন ঐ সময়

বাড়িটাও এক নজর দেখে আসা হয় এতে তার তেমন আপত্তি করার থাকে না কিছু, নিজের কাজে তো আসেনি, এসেছেন দেশ সেবার কাজে, দশের কাজে।

নিজের দেশ হলে কি হবে তবুতে তিনি একজন স্বনামধন্য নেতা। তাই দেশবাসীরা মন্ত্রী সাহেবের আগমন সংবাদ পেলেই হন্তদন্ত হয়ে তোরণ তৈরি করেন পথের মাঝে মাঝে। বড় দরদী বন্ধু আসছেন জনসেবায়।

সভাও ডাকেন দেশবাসী।

কান্দাই শহরের রাস্তায় রাস্তায় প্রচার চলে সভায় বক্তৃতা করবেন স্বনামধন্য মহামান্য মন্ত্রিবাহাদুর মাওলানা নিজাম রেয়াজী সাহেব। আপনারা দলে দলে যোগদান করে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করুন।

মন্ত্রিবাহাদুর দেশে গমন করেন।

চারপাশে তাকে ঘিরে আছে রথি–মহারথিগণ।

রাইফেলধারী, পুলিশবাহিনী, চাকুরীজীবি তারা তো রয়েছেন না থাকলে চাকুরি এক দিনেই

সকাল থেকেই রাস্তায় পাহারা।

বন্দুক ঘাড়ে।

এই পথে আসবেন স্বনামধন্য মন্ত্রিবাহাদুর, কেউ যেন পথে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে। কোন যানবাহন চলা নিষেধ। কারণ দেশপ্রেমিক নেতা আছেন দেশসেবায়। আহা বেচারী মন্ত্রিবাহাদুরের কত দয়া।

পা শক্ত লোহা বনে যায় পুলিশবাহিনীদের।

এদিক ওদিক তাকাবার হুকুম নেই।

তোমরা পুলিশের চাকুরি করো আরাম তোমাদের জন্য হারাম।

তবুও তো মানুষ মাঝে মাঝে নড়তে চেষ্টা করে কিন্তু সাহস পায় না। যদি হঠাৎ কেউ দেখে ফেলে তাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মন্ত্রী বাহাদুর আসেন।

নগরের সৌধ দ্বারে তোরণ তৈরি হয়েছে। অবশ্য মাসে একবার কিংবা দুবার এ তোরণ তৈরি হয়, কারণ জনদরদী নেতা আসবেন এটা কম কথা? তিনি তো সাধে আসছেন না, দেশের টানে জনসেবায় আসছেন। তোরণ তৈরিতে বেশি খরচ হয় না, সামান্য হাজার দুই তিন। নগণ্য মানুষের একটি পরিবারের ছমাসের খরচ বৈ তো নয়।

সামান্য তোরণ তবু যদি জননেতা খুশি হন তাহলে দেশের ভাগ্যি দেশের জনগণের ভাগ্যি। আজকাল কান্দাই সরকার ফুলের মালা বর্জন করেছেন তাই দেশের স্বনামধন্য নেতাগণ মনের ইচ্ছাকে ধামাচাপা দিয়ে মুখে হাসি টেনে বলেন– ফুলের মালা আমাদের প্রাপ্য নয়, ওগুলো যারা দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন মানে আত্মবলি দিয়েছেন তাদের জন্য। আমরা চাই তোমাদের ভালবাসা মানে তোমাদের সহযোগিতা। এসো ভাইসব দেশ গড়ি শুধু বক্তৃতা দিলে চলবে না কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমরাই দেশের নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক কর্মী। আমরাই দেশকে জাগাতে পারি, আমরাই দেশের মুখে হাসি যোগাতে পারি। আমরাই দেশের সব অভাব অনটন দূর করতে পারি। আমাদের হাতকে আমরা লোহার হাতুড়ির মত শক্ত করে নিতে পারি। আমরা দেশের সন্তান জনগণের দুঃখ আমার দুঃখ, জনগণের ব্যথা আমার ব্যথা, জনগণ যদি কাঁদে তবে আমি শুষ্ক চোখে থাকতে পারিনা...মন্ত্রী মহোদয়ের হাত চলে যায় টেট্রন প্যান্টের অথবা সিল্ক পাঞ্জাবীর পকেটে। হাতড়ে রুমাল তুলে আনেন, চোখ মোছেন জনগণের দুঃখে। আহা বেচারী স্বনামধন্য মন্ত্রীবাহাদুরের কত দয়া।

গলাও ধরে আসে মহান নেতার।

কেউ গেলাস ভরে পানি এনে টেবিলে রাখেন।

মন্ত্রীবাহাদুর চোখ থেকে রুমাল সরিয়ে লোকটাকে ধমক দেন বেয়াদব, পানির গেলাসের তলায় একটা পিরিজ বা পেয়ালা নিয়ে আনতে পারো নি?

লোকটা হাতে হাত কচলায় এবং গেলাসটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সত্যি সে ভুল করেছে মহা ভুল স্বনামধন্য ব্যক্তির সম্মুখে এমন বেয়াদবি বড় অপরাধ। তবু মন্ত্রীবাহাদুর বড় দয়ালু, তাই তো ওকে মাফ করে দেন।

বক্তৃতা চলছে। মন্ত্রীবাহাদুর জনগণকে লক্ষ্য করে অনেক বাণী রাখলেন যা শ্রবণ করে দেশের জনগণের মনে জনশক্তি বেড়ে গেলো চরম আকারে। সবাই হর্ষধ্বনি করে বারবার মন্ত্রীবাহাদুরকে মারহাবা জানালেন।

জনগণই তো দেশের উৎস, দেশের শক্তি। এই শক্তি নিয়েই মন্ত্রী মহান লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেবার দিন ফুরিয়ে গেছে, শুধু কাজ আর কাজ কিন্তু মহান নেতার বক্তৃতা ফুরায় না।

জনগণ অনেক খেটে খুটে মন্ত্রীবাহাদুরকে জয়যুক্ত করেছেন, কাজেই তার সুমধুর বাক্য শ্রবণে মোটেই বিরক্ত নন। তাঁর বাণীই যে সব ক্ষুধা, সব জ্বালা উপশম করে দেবে।

স্বনামধন্য মন্ত্রীবাহাদুর বক্তৃতা দিতে হাঁপান না, তবে ঘেমে নেয়ে উঠেন–বিশাল বপু কিনা তাই। আহা বেচারী দেশের জন্য কত দরদ, কত ব্যথা–তাই তিনি মাঝে একবার দেশে আসেন জনসেবায়, তখন মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু নিজ বাস ভবনে গমন করতে বাধ্য হন, স্ত্রী–পরিবার রয়েছে তাদের খোঁজ খবরটা নেওয়া একান্ত ফরজ। তবে সরকারি কাজে এসেছেন তাই কেমন যেন বেমানান লাগে। ভাতাও তো আর কম পান না। জনদরদী মন্ত্রীবাহাদুর এসব ভাতাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করেন। তিনি দেশের জনগণকেই শুধু ভালবাসেন না, ভালবাসেন কান্দাই সরকারকে। অহেতুক সরকারের পয়সা তিনি নষ্ট করতে চান না।

শুধু মাওলানা নিজাম রেয়াজি নন, কান্দাইয়ের প্রতিটি স্বনামধন্য মন্ত্রীবাহাদুর সবাই প্রায় একই মনোভাবাপন্ন, জনসেবায় তারা আত্মবলি দিতে একপায়ে খাড়া। তবে সব সময় কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস নেই তাই শুধু বক্তৃতা মঞ্চ পর্যন্তই তাদের আশা করা যায়।

চোখে সুরমা, পাঞ্জাবীতে খুসবু মাখিয়ে সরকারি গাড়িতে এখানে সেখানে যেতে পারেন, তবে খরা রৌদ্রতাপে নয়। বেচারী স্বনামধন্য মহান ব্যক্তিগণ তো সাধারণ মানুষ নন, তারা হলেন গিয়ে মন্ত্রীবাহাদুর, দেশপ্রেমিক মহান নেতা। যদিও তাদের ফটকের কাছে সাধ্য নেই জনগণ অথবা গ্রাম্য কোনো ব্যক্তি কিংবা গরিব কোনো মানুষ পৌঁছাতে পারে। তাদের অভাব অভিযোগ শোনার সময়ই বা কোথায়? সদা ব্যস্ত তারা দেশসেবায়।

কান্দাই সরকার দেশপ্রেমিক ভাইদের জন্য কি না করেছেন। শুধু বাড়ি গাড়ি ইমারতই নয়, মোটা অংক ভাতা, মাহিনা বললে অসম্মান করা হয়, তাই ভাতা বলাই শ্রেয় বরাদ্দ করেছেন।

মন্ত্রীবাহাদুরগণ দেশদরদী, আরও বেশি দেশদরদী হলেন যারা মন্ত্রীমহোদয়গণের পরিষদ। তারা আসেন, সবসময় ঘিরে থাকেন মহান নেতাদের, কারণ তারাই হলেন দেশের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। অন্যায় অনাচার দুর্নীতি যাতে দেশে না হয় এজন্য বেচারী সাহেবদের কত না প্রচেষ্টা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তবে তারা নিজেরা কোনো দুর্নীতি গ্রহণ করেন না, তবে বেশি নয়, গরিব জনগণের নিকট থেকে যার যা ক্ষমতা আছে তাই তারা গ্রহণ করেন, কত দয়া এই সব মহান ব্যক্তির।

মাওলানা নিজাম রেয়াজিও কান্দাইয়ের স্বনামধন্য মহান নেতা।

মুখ ভরা দাড়ি, বিশাল বপু, ললাটে এবাদতের চিহ্ন, পরিধানে পাজামা পাঞ্জাবী, বড় আউলিয়ার মত চেহারা। নিজাম সাহেব সরকারি ভবন থেকে বেরিয়ে এলেন একসময় তার হোটেলে।

নিজাম রেয়াজি হোটেলের সামনের ভাগ দিয়ে প্রবেশ করেন না, তিনি হোটেলের মালিক বটে কিন্তু তার আনাগোনা পিছন দিক দিয়ে। যেন কেউ না জানতে পারে নিজাম রেয়াজি এত বড় হোটেলের মালিক।

এমন কি সরকার নিজেও জানেন না তার মন্ত্রীমহোদয়দের কত রকম ব্যবসা আছে। কত তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স। জনগণ যাদের যাচাই করে বেছে নিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই খাঁটি সোনার মানুষ।

বিস্ময়ভরা এই দুনিয়া।

বড় নিষ্ঠুর এর রূপ।

আলোর নিচে যেমন গভীর অন্ধকার, তেমনি মহান মহৎ ব্যক্তি নামধারীদের বাইরের চেহারার আড়ালে আছে আর একটা রূপ যা ভয়ংকর হিংস্র জন্তুর চেয়েও মারাত্মক। সুধী ব্যক্তির মুখোশ পরে এরা জনগণের কাছে বড় বড় বুলি আওড়ায়, এরাই জনগণের সর্বশেষ মূল্য।

স্বার্থান্বেষী মহান নেতাদের একজন নিজাম রেয়াজি।

রক্ত শোষক বাদুড় বলা যায়।

নিজাম রেয়াজি তার গদিতে এসে বসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ফুরসী হুঁকোর নলটা তার মুখে গুঁজে দিলো অতি যত্ন সহকারে। তারপর সেলাম ঠুকে সরে গেলো পিছু হটে নবাবী কায়দায়।

নবাব আমলে দাসদাসীগণ এভাবে নবাব বাহাদুরকে সম্মান দেখাতো।

এ যুগেও এ ধরনের খেদমত চলে থাকে নেতৃস্থানীয় মহলে।

নিজাম সাহেব সুগন্ধী তামাক সেবনে নিয়োজিত হলেন। তারপর এক সময় বললেন–কখন সংজ্ঞালাভ করেছেন মিঃ নূর?

পাশেই দন্ডায়মান ছিলো একজন কর্মচারী সে বললো–গতকাল।

তার সম্বন্ধে কি প্রস্তুতি নিয়েছে তোমরা?

যা হুকুম করবেন তাই হবে মালিক?

একেবারে খতম করে দেওয়াই ভাল।

হাঁ, আমরাও এটা সমর্থন করি।

কারণ?

মালিক, কারণ সে বড় চালাক এবং ধূর্ত, যে কোনো ভাবে পালাতে পারে। কাজেই তাকে একেবারে…

হাঁ, খতম করে দাও। মাওলানা নিজাম রেয়াজি শেষ কথা বললেন।

ওরা চলে যাচ্ছিলো।

নিজাম রেয়াজি বললেন–শোন একেবারে গুম কুয়ায় ফেলে দেবে যেন কেউ জানতে না পারে।

মাওলানা নিজাম রেয়াজি একজন দেশপ্রেমিক, একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, একজন জনসেবক, তিনিই যে দেশ ও দশের কি সর্বনাশ করে চলেছেন এ কথা কেউ জানেন না, জানেন তিনি মহান এক ব্যক্তি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন জনগণের উদ্দেশ্যে বড় বড় বুলি আওড়ায় মাওলানা সাহেব, তখন তার গন্ডেবয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা, আহা, বড় জনদরদী বন্ধু নিজাম রেয়াজি।

এহেন জনদরদী নেতার গোপন নির্দেশক্রমে দেশের কত নিরীহ মানুষের চরম ক্ষতিসাধন হচ্ছে সে খোঁজ অনেকে জানলেও কারো বলবার সাহস হয়না কারণ তারা সরকারের লোক।

অবশ্য যখন তারা জনগণের দ্বারে দ্বারে গিয়েছিলো ভোট ভিক্ষার জন্য তখন তারা বিড়াল তপস্বী সেজেই হাজির হয়ে ছিলেন। আহা, বেচারী জনদরদী বন্ধু…

যাক নিজাম রেয়াজিকে নিয়ে ভাববার সময় এখন নেই। ওদিকে নিজাম রেয়াজির অনুচরদ্বয় এসে হাজির হলো অন্ধ গুহার সামনে। এই অন্ধগুহায় বা অন্ধকক্ষে বন্দী আছে নুর।

ফটক খুলে ফেলা হলো।

নূর বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো।

সংজ্ঞা তার ফিরে আসার পর সে কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছিলো। ভেবে পাচ্ছে না, কি করে সে এখানে এলো, আর এটা কোন জায়গা।

বন্দীশালার দরজা খুলে যেতেই দুজন সেই অন্ধকক্ষে প্রবেশ করলো।

নূরকে বেধে ফেললো ওরা মজবুত করে পিছমোড়া করে।

তারপর নিয়ে চললো ওরা টেনে হিঁচড়ে নূরকে। কোথায় নিয়ে চললো ভাবতে পারছে না সে। এমন কোনো ওষুধ দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছিলো যার দরুন নূর এখনও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। নাহলে নূরের দেহেও কম শক্তি ছিলো না, নিশ্চয়ই এত সহজে এই নরপশুরা তাকে আয়ত্তে আনতে পারতো না।

নূরকে ওরা এমন একটা কক্ষে নিয়ে এলো যে কক্ষটা হলো মাংস রক্ষণাবেক্ষণের কক্ষ। পাকার মাংস রাখা হয়েছে। চাপ চাপ রক্ত জমে আছে স্থানে স্থানে।

ঝকঝকে ধারালো খাড়ার মত এক একটা দা। ঝকমক করছে। সেকি ভীষণ আকার দা গুলো।

একজন বললো–একে জবাই করে মাংসের সাথে মিশিয়ে ফেলো, কেউ টের পাবে না, বরং তরকারির মান বেড়ে যাবে, স্বাদ বাড়বে…

হাঁ, তাই বটে।

তাহলে ধরে জবাই করে ফেলি।

নূরকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছিলো।

একটুও যাতে নড়তে না পারে সেজন্য অতি সতর্কতা অবলম্বন করেছিলো ওরা এবং যাতে সে কিছু বুঝতে না পারে তার জন্য মাঝে মাঝেই ক্লোরোফর্ম করা হয়েছে। নুর যদিও এখন সংজ্ঞা লাভ করেছিলো কিন্তু তার সম্বিৎ ছিলো না।

ওরা নূরকে জবাই করার জন্য কক্ষটার একপাশে নিয়ে গেলো এবং অপরজন বিরাট এক ধারালো দা তুলে নিলো হাতে।

আরও কয়েকজন ছিলো তারাও প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালো, যদি নড়াচড়া করে তাহলে প্রয়োজন হবে ওদের।

নূরকে ওরা উবু করে ধরলো।

পেছনে হাত দুখানা বাঁধা।

এমন কি মুখটাতেও রুমাল বেঁধে নিলো যেন কোনো শব্দ করতে না পারে।

নূরকে জবেহ করবার পূর্বে একজন বলে উঠলো–এর আগে প্রায় পঁচিশটা লোককে আমরা এতদিনে খতম করেছি কিন্তু এমন তরুণকে আমরা জবেহ করিনি। সত্যি ভারী সুন্দর চেহারা, বড় মায়া হচ্ছে।

অপরজন বললো–তরুণ বয়সে ডিটেকটিভ বনে ছিলো, তাই সে শিকার হলো মাওলানা সাহেবের। মাওলানা সাহেব কি আর সাধে একে পাকড়াও করেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের ভয় ছিলো, তাই...

তা অবশ্য সত্য, নইলে কি আর একে ধরে আনবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বড় ধূর্ত, বড় চালাক গোয়েন্দা, তাই একে খতম করার দরকার বলে মনে করেছেন মালিক।

হাঁ ঠিক তাই, কিন্তু এর পূর্বেও যে আমরা বেশ কিছু ব্যক্তিকে আমাদের হোটেলের প্লেটে পরিবেশন করেছি।

চুপ, এ কথা মালিক জানে না।

বলি কি, মালিক জানে না। সব জানে, সে সব জানে।

জানে। আমরা তার নির্দেশেই তো এসব কাজ করেছি, কিন্তু ঐ যে মাংসের সঙ্গে...

হাঁ, ঐটা তিনি জানেন না।

যাক, কিছু পয়সা মানে মাংসের পরিমাণ বাড়িয়ে কিছু অর্থ আমাদের ভাগে আসছে।

আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, এবার আমরা যে কাজে হাত বাড়িয়েছি তাই সফল করো।

ওরা এবার শক্ত করে ধরলো নূরকে।

একজনের হাতে ধারালো অস্ত্র।

এবার সে অস্ত্র বাগিয়ে ধরে নূরকে জবেহ করতে উদ্যত হলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জমকালো পোশাক পরিহিত একজন এসে প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করলো ছোরাধারীকে, হাতখানা মোচড় দিয়ে ধরতেই ছোরাখানা ওর হাত থেকে খসে পড়লো।

জমকালো ছায়ামূর্তি ভীষণ এক ঘুষি বসিয়ে দিলো একজনের নাকে।

রামদা নিয়ে আক্রমণ করলো ওরা।

জমকালো ছায়ামূর্তি পিস্তল উদ্যত করে ধরলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী করলো কয়েকজনকে।

শব্দবিহীন পিস্তলের গুলিতে কয়েকজন ভূতলশায়ী হলো কিন্তু একটুও টের পেলো না কেউ। কারণ কোনো শব্দ হলো না এই পিস্তলের।

আশ্চর্য বটে, গুলীর আঘাতে প্রাণ হারালো কিন্তু টুশব্দ করতে পারলো না কেউ।

আস্তে ঢলে পড়লো সবাই এক এক করে।

জমকালো মূর্তি নূরকে তুলে নিলো কাঁধে।

মাত্র কয়েক মিনিট, তারপর বেরিয়ে গেলো সে নিঃশব্দে।

হোটেলের পেছন দিকে গাড়ি অপেক্ষা করছিলো।

ছায়ামূর্তি নূরের অর্ধচেতন দেহটা নিয়ে শুইয়ে দিলো পেছন আসনে, তারপর গাড়ি অন্ধকারে অন্তর্ধান হলো।

*

মাওলানা নিজাম রেয়াজি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যখন জানতে পারলেন তার হোটেলের পেছনে মাংস রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষে তারই কয়েকজন কর্মচারী নিহত হয়েছে। কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি তাদের হত্যা করে পালিয়ে গেছে এবং সে যাবার সময় নিয়ে গেছে তার বন্দী মিঃ নূরকে।

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ব্যস্তসমস্ত হয়ে টেলিফোন করলেন পুলিশ অফিসে, কিন্তু তিনি চেপে গেলেন বন্দীর কথা। কারণ বন্দীকে নিয়ে পুলিশমহলে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, বন্দী সাধারণ লোক নন, একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ।

মাওলানা নিজাম রেয়াজি জানেন সবকিছু, কারণ তিনি নিজেও সরকারের লোক, একজন নেতা। তিনিও এ ব্যাপারে অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছেন অথচ হেসেছেন মনে মনে সবার অলক্ষ্যে।

আজ যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন মাওলানা নিজাম রেয়াজি তাতে পুলিশমহলকে না জানিয়ে উপায় নেই, তাই তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে টেলিফোন করলেন।

পুলিশমহলে সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসলেন পুলিশ সুপার স্বয়ং পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে করে। পুলিশ সুপার ইতিপূর্বে জানতেন না মাওলানা নিজাম রেয়াজির এমন একটা হোটেল আছে। পুলিশ সুপারের চক্ষুস্থির হলো যখন তিনি হোটেলের অভ্যন্তরে তদন্ত চালিয়ে দেখলেন।

যে ব্যক্তিগণ নিহত হয়েছে তাদের চেহারা দেখেও কেমন সন্দিহান হলেন পুলিশ সুপার কিন্তু কোনো উক্তি উচ্চারণ করতে সাহসী হলেন না, কারণ মাওলানা নিজাম রেয়াজি হলেন কিনা মন্ত্রীবাহাদুর। তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা শুধু দোষণীয় নয়, অপরাধ।

পুলিশ সুপার সব তদন্ত করে নোট করলেন এবং লাশগুলো মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

নিজাম রেয়াজি পুলিশ সুপারের নিকট চেপে গেলেন বন্দী সম্বন্ধে সবকথা। বরং তিনি নিজে বললেন–একি সমস্যার সম্মুখীন হলাম আমরা? কদিন পূর্বে নিখোঁজ হলেন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নুরুজ্জামান চৌধুরী, তারপর নিখোঁজ হলেন বিখ্যাত ধনবান মিঃ বার্ড; তারপর আমার সামান্যতম হোটেলটার ভীষণ ক্ষতি সাধন। এমনভাবে এতগুলো কর্মচারীকে কে বা কারা হত্যা করলো, সত্যি বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। দেখুন এই হত্যাকারী কে, খুঁজে বের করতেই হবে এবং তাকে চরমভাবে শাস্তি প্রদান করতে হবে, নাহলে আমি সব তচনচু করে ফেলবো।

পুলিশমহল ভীষণ ভড়কে গেলো।

মাওলানা নিজাম রেয়াজির এই ক্ষতি সাধন পুলিশমহলকে নাড়া দিলো। পুলিশমহল হন্তদন্ত হয়ে পড়লো।

জোর তদন্ত শুরু হলো।

চারদিকে পুলিশ গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

একেই পুলিশমহল ভীষণভাবে নাজেহাল পেরেশান হয়ে পড়েছেন মিঃ নূরুজ্জামানের নিখোঁজ ব্যাপারে, তারপর প্রতিদিন নানা ধরনের দুর্ঘটনা যেন লেগেই আছে।

কালোবাজারী দুস্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে অত্যধিক। সামান্য কমাসে এমন পরিবর্তন সত্যি যেন আশ্চর্য ব্যাপার।

এখানে সেখানে খুনখারাবি লেগেই আছে। পুলিশমহল কিছুতেই পারছে না সংযত করতে। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না যে পুলিশমহল।

মাওলানা নিজাম রেয়াজির ঘটনাটা ভাবিয়ে তুললো পুলিশমহলকে। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে কি না সন্দেহ।

জোর তদন্ত চালিয়েও কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না। এমন কোন কু রেখে যায়নি হত্যাকারী যার দরুন তাকে খুঁজে বের করা যায়।

তবু পুলিশমহল তাদের কর্তব্য পালন করে চললো। ছড়িয়ে পড়লো পুলিশমহলের লোক।

একসঙ্গে প্রায় দশ বারো জনকে শব্দহীন পিস্তলের গুলিতে নিহত করা হয়েছে।

পুলিশমহল বিদায় হলেও মাওলানা নিজাম রেয়াজি ক্ষান্ত হলেন না, তিনি নিজেও অনুচর বা নিজ কর্মচারীদের হুকুম করলেন–এই হত্যাকারীকে খুঁজে বের করো। শুধু হত্যাই সে করেনি, তাদের শিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

ওদিকে নূরের হঠাৎ অন্তর্ধানে চৌধুরীবাড়িতেও চিন্তার অন্ত নেই। মরিয়ম বেগম, মনিরা এমনকি বৃদ্ধ সরকার সাহেবও অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ করে নূর গেলো কোথায়?

এদিকে পুলিশমহলও এ ব্যাপার নিয়ে অতিমাত্রায় বিচলিত রয়েছেন।

কদিনে হয়রান পেরেশান হয়ে পড়েছেন পুলিশসুপার স্বয়ং।

অফিসে মাথায় হাত রেখে ভাবেন মিঃ হারুন। তিনি নিজেও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, নূরের হঠাৎ করে অন্তর্ধানে তিনি বেশি বিচলিত হয়েছেন, কারণ তিনি জানেন দস্যু বনহুর নিহত হয়নি, সে জীবিত এবং সম্পূর্ন সুস্থ রয়েছেন।

তাহলে কি এই রহস্যজনক নিরুদ্দেশের পেছনে স্বয়ং দস্যু বনহুরের কোনো কারসাজি আছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে নিজের সন্তানকে সে হরণ করে নিয়ে যাবে বা গেছে…

চিন্তাধারায় বাঁধা পড়ে।

মিঃ শংকর রাওয়ের গাড়ি এসে থামলো মিঃ হারুনের অফিসরুমের দরজায়।

গাড়ি থেকে নেমে অফিসরুমে প্রবেশ করলেন মিঃ শংকর রাও।

মিঃ হারুন তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

*

বলেন মিঃ শংকর রাও।

বললেন মিঃ হারুন–মিঃ নূরের অন্তর্ধান নিয়ে আমি গভীরভাবে ভাবছি।

হাঁ, মিঃ হারুন, আমিও এ ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত। জানি না মিঃ নূর কোথায় উধাও হলেন। তিনি নিজ ইচ্ছায় গা ঢাকা দিয়েছেন না কেউ তাকে উধাও করেছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

তবে এটা সত্য যে কোনো রহস্য আছে এর পেছনে। দস্যু বনহুর তো তাকে হরণ করেনি?

অসম্ভব কিছুই না।

কিন্তু কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

হাঁ, ভাববার কথা, মিঃ নূরকে এভাবে সরানোর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

আমার তাই মনে হচ্ছে এবং এ কাজ বনহুর ছাড়া আর কারও নয়....

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

মিঃ হারুন রিসিভার তুলে নিলেন হাতে–হ্যালো স্পিকিং মিঃ হারুন।

ভেসে এলো অজানা এক কণ্ঠস্বর মিঃ নূরুজ্জামান চৌধুরী কান্দাই হসপিটালে আছেন, তাকে নিয়ে যান।

হ্যালো...্যালো আপনি কে কোথা থেকে বলছেন?

কিন্তু মিঃ হারুনের কথা শেষ হয় না, ওদিকে রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

মিঃ হারুনও রিসিভার রাখলেন।

শংকর রাও বললেন–কে ফোন করেছিলো মিঃ হারুন?

বললেন মিঃ হারুন–অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি।

কি সংবাদ?

সুসংবাদ বলা যায়।

শংকর রাও মিঃ হারুনের চোখেমুখে একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করেন, তিনি বলেন–সুসংবাদ? বলুন মিঃ হারুন কি সুসংবাদ?

মিঃ নূরুজ্জামানকে পাওয়া গেছে।

বলেন কি।

হাঁ।

কোথায়? কোথায় মিঃ নূর?

কান্দাই হসপিটালে...

তার মানে? অবাক কণ্ঠে বললেন মিঃ শংকর রাও।

মানে ঠিক আমিও বুঝতে পারছি না। কে এক ব্যক্তি বললো কান্দাই হসপিটালে মিঃ নূর আছেন, তাঁকে নিয়ে যান।

কথাটা কি সত্যি?

আমি নিজেও বুঝতে পারছি না কথাটা সত্যি কিনা?

তাহলে পুলিশ অফিসে সংবাদটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

হাঁ, আমি এক্ষুণি জানিয়ে দিচ্ছি এবং পুলিশ সুপারকেও আসার জন্য বলছি।

তক্ষুণি পুলিশ অফিসে ফোন করে নূরের সংবাদটা জানিয়ে দিলেন মিঃ হারুন। এবং পুলিশ সুপারকে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন।

সংবাদ পেয়ে পুলিশ সুপার স্বয়ং হাজির হলেন, তার চোখেমুখে আনন্দ উচ্ছ্বাস। মিঃ নূরের অন্তর্ধানে পুলিশমহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। হঠাৎ কোথায় গেলেন বা কে তাকে উধাও করলো।

এ ব্যাপার নিয়ে এতদিন ভীষণ উদ্বিগ্নতা চলেছিলো সমস্ত শহরে।

চৌধুরীবাড়িতেও কান্নাকাটি শুরু হয়েছিলো। এ সংবাদ যেমন বিস্ময়কর ছিলো তেমনি বেদনাদায়ক। চৌধুরীবাড়ির নয়নের মণি ছিলো মিঃ নূর, এ কথা সবার জানা ছিলো, তাই পুলিশমহল থেকে শুরু করে শহরবাসিগনও এ ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত ছিলো।

মিঃ নূরকে পাওয়া গেছে শুনে পুলিশমহল একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে যেন মুক্তি পেলো। পুলিশ সুপারের সঙ্গে চলে এলেন আরও দুতিনজন পুলিশ অফিসার।

মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং কান্দাই পুলিশ সুপার আরও দুজন পুলিশ অফিসারসহ কান্দাই হস্‌পিটালে হাজির হলেন।

মিঃ নূরকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে খুশি হলেন পুলিশপ্রধানগণ।

মিঃ হারুন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন–হঠাৎ কি ঘটেছিলো মিঃ নূর?

নূর শান্তকণ্ঠে বললো–এসব নিয়ে পরে আলোচনা করবো, এখন আমি ফিরে যেতে চাই।

বেশি কথা হয় না এ কারণে।

মিঃ হারুন ও তার সঙ্গীরা মিঃ নূরকে নিয়ে ফিরে এলেন নূরের বাসভবনে।

এদিকে সংবাদ পেয়ে সাংবাদিকগণ এসে জড়ো হয়েছেন তাদের কাগজ কলম নিয়ে।

নূর এসে পৌঁছাতেই ভীড় জমে গেলো সাংবাদিকগণের। তারা নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন মিঃ নূরকে।

নূর শান্তভাবে জবাব দিয়ে চললো কিন্তু যতটুকু বলা প্রয়োজন ততটুকুই সে বললো সাংবাদিকগণের নিকটে।

পুলিশপ্রধানগণকেও এর বেশি জানালো না সে।

নূর যখন তার বক্তব্য পেশ করছিলো তখন কান্দাই পুলিশ সুপার বললেন–আশ্চর্য মিঃ নিজাম রেয়াজির হোটেলের কয়েকজন কর্মচারীর হত্যাকান্ডের সঙ্গে মিঃ নূরের নিরুদ্দেশ ব্যাপারটা জড়িত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু....

কথা শেষ না করেই পুলিশ সুপার গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

নূর স্থির শান্ত, তারও ললাটে ফুটে উঠেছে একটা গভীর চিন্তার ছাপ।

বললেন মিঃ হারুন–পুলিশ সুপার, আপনি কি মনে করেন মাওলানা নিজাম রেয়াজির হোটেলের হত্যাকান্ডের সঙ্গে মিঃ নূরের অন্তর্ধানের যোগসূত্র রয়েছে?

মনে হয় কিন্তু এ কি করে সম্ভব।

নূর কোন জবাব না দিয়ে ভাবতে থাকে। তার সুন্দর মুখমন্ডলে একটা ভাবনার গভীরতা ফুটে উঠে।

এক সময় বলে নূর–এ হত্যারহস্য নিয়ে আমি আপনাদের সহযোগিতা করবো এবং হত্যারহস্যের মূল রহস্য উদঘাটন করবো।

পুলিশ সুপার খুশি হয়ে বললেন–নিশ্চয়ই খুশি হবো এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা পেলে।

এক সময় বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ হারুন ও তার দলবল।

পুলিশ সুপারও বিদায় নিলেন।

সবাই চলে গেলে নূর চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। সেই রাতের ঘটনা থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব একটা পর একটার করে ছায়াছবির মত মনে পড়ছে তার।

হঠাৎ পেছন থেকে কেউ তাকে জাপটে ধরলো এবং সঙ্গে সঙ্গে নাকে চেপে ধরলো রুমাল। মুহূর্তপর আর কোনো কথা স্মরণ করতে পারলো না নূর। তারপর যখন সংজ্ঞা লাভ করলো তখন সে স্বপ্নের মত কিছু কিছু খেয়াল করতে পারলো কিন্তু সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো। একটা অন্ধকার কক্ষ, চারপাশে কঠিন পাথরের বেড়াজাল। একটু আলোর জন্য নূর হাঁপিয়ে উঠেছিলো। এক ফোঁটা পানির জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিলো। ভেবে পাচ্ছিলো না কেমন করে সে এখানে এলো এবং এটা কোন স্থানে বা কোথায়? সম্বিৎ ফিরে এলেও তেমনভাবে ফিরে আসেনি, কেমন যেন অর্ধ অচৈতন্য ভাব ছিলো। তারপর অন্ধকক্ষের দ্বার খুলে গিয়েছিলো। কে বা কারা তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলো। সে এক ভয়ংকর কক্ষ, স্তুপ স্তূপ মাংস আর রক্ত মাংস আর রক্ত....উঃ কি ভয়ংকর সেই মুহূর্ত। সব কিছু ভালভাবে স্মরণে আসছে না তবুও মনে পড়ছে একটা বলিষ্ঠ লোক ধারালো দা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলে তাকে জবাই করতে কিন্তু সেই দন্ডে এক জমকালো মূর্তির আবির্ভাব হলো তারপর কি ঘটলো কিছু মনে নেই তারপর হসপিটালে নিজেকে দেখতে পেলো....কে সেই ব্যক্তি? তবে কি তার পিতা দস্যু বনহুর তাকে...নিশ্চয়ই সে জীবিত আছে...শুধু তাকেই মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেনি, উদ্ধার করেছিলো পুলিশপ্রধান মিঃ হারুন ও তার দলবলকে। সবকথাগুলো আজ স্মরণ হচ্ছে। দস্যু বনহুর তার পিতা–দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্যই সে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিদেশ থেকে দক্ষ ডিটেকটিভভের সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছিলো, শেষ পর্যন্ত দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতেও সে সক্ষম হয়েছিলো... তার শপথ সফল হয়েছে কিন্তু...তার সেই দেব সমতুল্য পিতা দস্যুএকজন ডাকুনূর আজ নতুন করে ভাবতে শুরু করে। এলোমেলো নানা চিন্তার উদ্ভব হয় তার মাথায়। একা নিরিবিলি বড় ভাল লাগছে আজ নূরের। বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য একদিন নূরের বিপুল আগ্রহ ছিলো।

বনহুরকে গ্রেপ্তার করাই ছিলো তার জীবনের সাধনা, গ্রেপ্তার করে সে যখন মহাখুশির উচ্ছ্বাসে বনহুরের হাতে হাতকড়া পরাতে গিয়েছিলো তখন সে খুলে ফেলেছিলো তার মুখের আবারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত আনন্দ ধুলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছিলো। শুধু বিস্ময় নয়, প্রচন্ড একটা আঘাত লেগেছিলো তার বুকে, যা সে কোনোদিন ভুলবে না। তার আব্বু স্বয়ং দস্যু বনহুর এটা সত্য বলে নূর সেদিন বিশ্বাস করতে পারছিলো না। কিন্তু মিথ্যা নয় একেবারে খাঁটি সত্য, একেবারে ধ্রুব সত্য। চাঁদের মত সত্য সূর্যের মত সত্য সেদিন নূর লজ্জায় ঘৃণায় মুষড়ে পড়েছিলো। তাকে মেনে নিতে হচ্ছে তার আব্বু দস্যু সেই বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর। হঠাৎ নূর প্রচন্ডভাবে হেসে উঠলো, হাঁ, আমার আব্বু দস্যু বনহুর–আমি তারই সন্তান। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ। নতুন এক সৃষ্টি.....হাঃ হাঃ হাঃ...

নূর তুই ফিরে এসেছিস বাবা! তুই ফিরে এসেছিস কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করলো মনিরা।

মনিরার কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠলো নূর–হাঁ, আম্মি আমি ফিরে এসেছি

তুই কি পাগল হয়ে গেছিস নূর?

না না আম্মি, পাগল আমি হইনি।

তবে যে অমন করে হাসছিস্ নূর? বললেন মরিয়ম বেগম।

তিনি মনিরার পেছনে পেছনে কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন। নূর বাসায় ফিরে এসেছে কথাটা শোনার পর থাকতে পারেননি মরিয়ম বেগম তিনিও চলে এসেছেন পুত্রবধুর সঙ্গে।

নূরকে অদ্ভুতভাবে হাসতে দেখে বলেন মরিয়ম বেগম কথাটা।

নূর বললো–নতুন এক সৃষ্টি আনন্দে আমি আত্মহারা। দাদী আম্মি, আমি আজ নতুন এক অধ্যায় রচনা করেছি।

তার মানে?

বললেন মরিয়ম বেগম।

মানে আমি সাধারণ কোনো মানুষের সন্তান নই। আমার পিতা অসাধারণ এক ব্যক্তি। হাঃ হাঃ হাঃ আম্মি আম্মি, আমার আব্বুকে নতুনরূপে আবিষ্কার করেছি।

নূর তার মাকে ধরে উচ্ছল আনন্দে কথাগুলো বলে উঠলো।

মরিয়ম বেগম ও মনিরা নূরের আচরণে আশ্চর্য না হয়ে পারে না। কই, এর পূর্বে তো এমন আচরণ নূরের মধ্যে লক্ষ্য করেনি তারা।

মরিয়ম বেগম বললেন–নূর কি হয়েছে দাদু?

এখনও বুঝতে পারোনি, আমার আব্বুকে আমি আবিষ্কার করেছি .....

এ সব কি বলছিস্ তুই? বললেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা নির্বাক।

ভাবছে সে তার সন্তান নূর তাহলে পাগল হয়ে গেছে। এসব কি বলছে সে? তার আব্বুকে নিয়ে কথা বলছে, ব্যাপার কি?

বললো মনিরা–নূর, তুই কি পাগল হয়েছিস?

না আম্মি, না। শোন আমার আপু আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। একেবারে অন্ধ গহ্বর থেকে মৃত্যুগুহা থেকে আম্মি আম্মি...আমার আব্বু স্বয়ং দস্যু বনহুর!

মরিয়ম বেগম এবং মনিরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন নূরের মুখের দিকে। যে নূর পিতু পরিচয় পাওয়ার পর থেকে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো, মুষড়ে পড়েছিলো। সেই নূর আজ বলছে তার আব্বু এক অস্বাভাবিক পুরুষ। তার আব্বুকে নূর আজ নতুন করে আবিষ্কার করলো।

তাহলে কি নূর তার আব্বুকে খুঁজে পেয়েছে? হয়তো পেয়েছে, না হলে নূর হঠাৎ আজ এমনভাবে আব্বুর নেশায় ...

দাদী আম্মি কি ভাবছো?

ভাবছি তোকে আজ নতুন মানুষ রূপে আবিষ্কার করলাম। সত্যি তোর আব্বু....

হাঁ দাদীআম্মি, আমার আব্বুকে আমি পেয়েছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো নূর, তারপর দাদীকে বসিয়ে দিয়ে মনিরাকে বসিয়ে দিলো অপর এক সোফায়, বললো–আম্মি, দাদী আম্মি, তোমাদের দোয়া আমার জীবনের পাথেয়–আমার জীবনের রক্ষার কবচ।

কি হয়েছে নূর? বললো মনিরা এবার।

বললো নূর–তুমি বেশি কিছু জানতে চেও না, জেনে রাখো শুধু আব্বু জীবিত আছেন এবং তিনি আমাকে সদ্য মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছেন।

নূর!

হাঁ আম্মি। যদিও আমার খুব স্পষ্ট মনে হচ্ছে না সব কিছু, তবু আমি যতটুকু খেয়াল করতে পারি ততটুকু বুঝতে পেরেছি আমার আব্বুই আমাকে কঠিন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আম্মি আম্মি, একদিন সব বলবো, সব বলবো তোমাদের কাছে। আজ শুধু জেনে রাখো, আজ আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি–স্বয়ং দস্যু বনহুর আমার পিতা।

অভিমানভরা কণ্ঠে বললো মনিরা– সে যদি তোক মৃত্যুর মুখ থেকে না রক্ষা করতো তাহলে তুই তাকে পিতা বলে স্বীকার করে নিতে পারতিস না।

আম্মি, আমার মনের আকাশে একখন্ড কালো মেঘ ছেয়ে ছিলো আজ সেই মেঘ মুক্ত হয়ে গেছে। আমি আবুকে নতুন রুপে আবিষ্কার করেছি। আম্মি আমাকে ক্ষমা করো।

নুর

আম্মি।

মনিরা নূরকে ছোট্ট শিশুর মত বুকে আঁকড়ে ধরলো। ললাটে গভীরভাবে চুম্বন করলো মনিরা সন্তানের।

মরিয়ম বেগমের গন্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দঅশ্রু। মুখে তার স্নিগ্ধ হাসির রেখা। মনেপ্রাণে তিনি যা কামনা করেছিলেন তাই হলো বা হয়েছে। পিতার প্রতি নূরের যে একটা ভিন্ন মনোভাব ছিলো তা কেটে গেছে।

*

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতেই অশ্ব দুপা উঁচু করে চিহি চিহি শব্দ করে উঠলো। তাজ যেমন করে প্রভুর স্পর্শে অদ্ভুত এক শব্দ করতো ঠিক তেমনি। জাভেদের অশ্বের কোনো লাগাম ছিলো না, ভীষণ চেহারার এই অশ্বটি বড় অদ্ভুত ছিলো। যেমন ছিলো জাভেদ তেমনি তার অশ্ব।

বনহুর বনে লালিত পালিত হলেও সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলো। মোটর ড্রাইভিং থেকে প্লেন চালনা সব জানা ছিলো তার।

কালু খাঁ বনহুরকে শুধু বনের সৌন্দর্য করেই গড়ে তোলেনি, গড়ে তুলেছিলো এক অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে। অনেকগুলো ভাষাতেও পারদর্শী ছিলো বনহুর। বনহুরের যেন তুলনা হয় না কারও সঙ্গে।

এহেন পিতার সন্তান নূর এবং জাভেদ।

নূর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পেরেছে আর জাভেদ ঠিক বিপরীত। সে কোনো রকম পুস্তক শিক্ষাই লাভ করেনি, শুধু সে নিজের বা নিজস্ব প্রতিভায় বিকশিত হয়েছে। অশ্বারোহণ, শিকার করা, বলিষ্ঠ শক্তির অধিকারী হয়েছে জাভেদ। তার আচরণ জংলী, দয়ামায়াও কম তবে জীবনের প্রতি তার মায়া বা দরদ আছে।

জাভেদ যখন তার অশ্ব নিয়ে জংগল অতিক্রম করে চললো তখন তাকে এক অদ্ভুত মানুষ বলে মনে হচ্ছিলো। মাথার চুলগুলো এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত ললাটে ছড়িয়ে আছে। একটানা সে উল্কা বেগে ছুটে চলেছে।

ঘন দূর্ভেদ্য জংগল।

বন্য পশুপক্ষী অশ্বপদশব্দে চারদিকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। জাভেদের অশ্ব ঠিক অশ্ব বলে মনে হয় না। একটা ভয়ংকর জীব বলে মনে হয়।

জাভেদ যখন তার অশ্ব নিয়ে ছুটতে থাকে তখন বনভূমি প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। পাথুরিয়া মাটিতে অশ্ব পদ শব্দ হয় খট খট খট

জাভেদ যখন বনভূমি অতিক্রম করে চলছিলো তখন জংলী মাংফা দল জানতে পারলো। তারা ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিলো জাভেদের উপর।

টের পেয়ে মাংফা দলের সর্দার সজাগ হয়ে উঠলো। তার দলবল বিরাট এক জাল নিয়ে ঘিরে ফেললো জাভেদকে।

জাভেদ বুঝতে পারেনি এমনভাবে মাংফা দল তাকে আক্রমণ করে বসবে। জালে অশ্বসহ। জড়িয়ে পড়লো জাভেদ।

যেন বন্দী সিংহ সে।

জাভেদ অশ্বসহ বন্দী হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বল্লম আর শরকি নিয়ে ঘিরে ধরলো তাকে মাংফা দল।

মাংফা দলের ভীষণ রাগ জাভেদের উপর। কারণ জাভেদ একদিন একজন মাংফা যুবককে হত্যা করেছিলো।

মাংফা যুবকটি হঠাৎ তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলো, তাকে ঐ পথে যেতে দেবে না।

ওদিকে তখন জাভেদ আশার নিকটে যাচ্ছিলো তাড়াহুড়ো করে, এমন সময় বাধা পেয়ে সে ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং বিনা দ্বিধায় সে হত্যা করে বসে মাংফা যুবকটাকে, ইতিপূর্বেও এমনি ধরনের এক দুর্ঘটনা ঘটেছিলো জাভেদের ভাগ্যে। আবার এমনিভাবে তাকে বন্দী হতে হলো।

কিন্তু জাভেদও কম নয়।

সে ক্রুদ্ধ সিংহের মত ক্ষেপে গেলো।

তাকে যখন জালসহ দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো ওরা, তখন জাভেদ প্রাণপণে নিজকে মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

কিন্তু সে পারলো না নিজকে মুক্ত করতে। তাকে তুলে নিলো ওরা জালসহ কাঁধে।

মাংফা দল বাস করতো নদীর ওপারে।

জাভেদকে নিয়ে ওরা যখন নদীতীরে গিয়ে পৌঁছলো তখন জাভেদ ঝাঁপিয়ে পড়লো জালসহ নদীবক্ষে। কোমরে ছোরা ছিলো, ছোরাটা খুলে নিয়ে জাল কেটে ফেললো দ্রুতহস্তে।

বেরিয়ে পড়লো জাভেদ জাল থেকে।

মাংফারা সব জানে কিন্তু তারা পানিতে সাঁতার কাটতে জানে না।

মাংফা সর্দার ভাবতেই পারেনি বন্দী তাদের বেড়াজাল ছিন্ন করে পালাবে।

মাংফাগণ ভেবেছিলো তাকে জালে আটকালে আর সে পালাতে সক্ষম হবে না, তাই তারা অনেকদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে জাভেদকে আটক করতে পেরেছিলো। যখন মাংফা সর্দার ও তার দলবল নদীর উপর দিয়ে বৃক্ষের গুঁড়ির সাঁকো পেরিয়ে যাচ্ছিলো তখন জাভেদ জালসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীবক্ষে।

এবার তাকে কে পায়।

মাংফাগণও কম নয়, তারা সাঁতার না জানলেও অস্ত্রচালনায় পারদর্শী।

জাভেদ নদীবক্ষে জালসহ ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাংফাগণ বর্শা নিক্ষেপ করেছিলো তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু জাভেদ জাল কেটে বেরিয়ে গেলো এবং ডুবসাঁতার কেটে দ্রুত সরে গেলো মাংফাদের নিক্ষিপ্ত বর্শার লক্ষ্য থেকে দূরে।

মাংফাদল যখন জাভেদকে জালসহ বেঁধে ফেলে তখন তার হাত দুখানা মুক্তই ছিলো এবং সে জন্যই কোমরের খাপ থেকে ছোরাখানা খুলে নিতে সক্ষম হয়েছিলো এবং শক্ত জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো।

মাংফা দলের নিক্ষিপ্ত বর্শার একটিও বিদ্ধ হলো না জাভেদের দেহে। জাভেদ ডুবসাঁতার কেটে চলে এলো অনেক দূরে।

এবার জাভেদ নদীবক্ষ থেকে মাথা তুলে লক্ষ্য করলো। না, মাংফাদের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। উঠে এলো সে তীরে কিন্তু ভিজে চুপসে যাওয়া শরীর নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর না হয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়লো। অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিলো সে কারণ মাংফাদের কবল থেকে জীবন রক্ষা করতে গিয়ে তাকে সংগ্রাম করতে হয়ে। ডুবসাঁতার দিতে গিয়ে অনেকক্ষণ তাকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকতে হয়েছিলো।

এবার জাভেদ চুল থেকে পানিগুলো ঝেড়ে ফেললো ভাল করে। তারপর উঠে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো মাংফা দল ফিরে যাচ্ছে সেই পথ দিয়ে।

জাভেদ দুঃসাহসী, ভয় বলে তার কিছু নেই। তা ছাড়া পিতার মতই কঠিন মন তার। সে কোনোদিন শত্রুকে দেখে আত্মগোপন করতে জানে না বরং প্রতিশোধ নেবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী।

মাংফাদের সর্দার সর্বাগ্রে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাভেদ বিলম্ব না করে পাশের বৃক্ষটি বেয়ে উপরে উঠে গেলো এবং বুলানো লম্বা শিকড় ধরে ঝুলে পড়লো, তারপর মাংফা সর্দারের উপর লাফিয়ে পড়লো সে অতর্কিতভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে মাংফা সর্দার মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

জাভেদ কালবিলম্ব না করে সর্দারের হাতের বর্শা তুলে নিলো এবং শুরু করলো যুদ্ধ।

জাভেদের সঙ্গে পেরে ওঠা দায়।

মাংফা সর্দার কিছুক্ষণের মধ্যেই জাভেদের হাতে নিহত হলো।

জাভেদ বর্শাবিদ্ধ করলো তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে মাংফাদল ভয়ে আতঙ্কে পিছু দৌড়ে পালাতে লাগলো। ওরা আর ফিরে তাকাতে সাহসী হলো না।

মাংফাদল যখন দৌড়াচ্ছিলো তখন জাভেদ মাংফা সর্দারের বুক থেকে সূতীক্ষ্ণধার বর্শা তুলে নিয়ে একজন মাংফাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। জাভেদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না, মাংফাটার পিঠে গিয়ে বিদ্ধ হলো, সেও আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো।

সামান্য সময়ে ফাঁকা হয়ে গেলো সেই স্থানটা।

মাংফাদল কে কোন্ দিকে দৌড়ে পালালো তার ঠিক নেই।

জাভেদ হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে।

এবার জাভেদ মুখের কাছে হাত নিয়ে উচ্চস্বরে আওয়াজ করতে লাগলো।

একবার, দুবার তিনবার।

জাভেদের অশ্বের কানে এ শব্দ পৌঁছালো কিনা কে জানে।

জাভেদ এবার একটা উঁচু টিলার উপরে দাঁড়িয়ে পুনরায় মুখের কাছে হাত নিয়ে শব্দ করলো। তারপর অপর এক টিলায়। এমনি করে জাভেদ তার অশ্বটাকে ডাকতে লাগলো।

ওদিকে মাংফাদল জাভেদের অশ্বটাকে মজবুত করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক ঐ সময় অশ্বটার কানে প্রবেশ করে প্রভুর কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক লম্ফ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে সে মোটা রশি। তারপর আর তাকে কে পায়।

উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো জাম্বি।

জাভেদ নিজ অশ্বের নাম রেখেছিলো জাম্বি। বড় অদ্ভুত অশ্ব। বড় অদ্ভুত নাম। আরও একটা নাম ছিলো জাভেদের অশ্বের। সে নাম পছন্দ নয় বলে জাভেদ এই জাম্বি নাম দিয়েছে।

জাম্বি ছুটছে।

ওর পেছনে ধাওয়া করে চললো মাংফাদল।

মাংফারা জানে না জাম্বি কোথায় যাচ্ছে। যদি তারা জানতো জাম্বি তার প্রভুর নিকটে যাচ্ছে তাহলে অনেকেই এগুতো না, ভয়ে পিছিয়ে আসতো।

মাংফাদল সূতীক্ষ্ণ বর্শা হাতে জাম্বির পেছনে ছুটছে, মাঝেমধ্যে বর্শা ছুঁড়ে মারছে অশ্বটাকে লক্ষ্য করে।

হঠাৎ একটা বর্শা গিয়ে বিদ্ধ হলো জাম্বির শরীরে।

মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো জাম্বি।

তারপর সব অবহেলা করে আবার সে ছুটতে শুরু করলো।

কিছু সময়ের মধ্যে জাম্বি পৌঁছে গেলো জাভেদের টিলাটার পাশে।

জাভেদ আনন্দধ্বনি করে উঠলো, তারপর লাফিয়ে পড়লো সে জাম্বির পিঠে।

মাংফাদল জাভেদকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বর্শা নিক্ষেপ করতে শুরু করেছিলো কিন্তু একটা বর্শাও জাভেদকে স্পর্শ করতে সক্ষম হলো না।

জাম্বি জাভেদসহ চলে এলো দূরে বহুদূরে।

যেখানে এসে জাম্বি থামলো সেখানে আশেপাশে তেমন জংগল বা বনভূমি ছিলো না।

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়লো।

এবং লক্ষ্য করলো জাম্বির শরীরে একটা বর্শা এখনও বিদ্ধ হয়ে আছে।

জাভেদ দুঃখ করে বললো–জাম্বি, তোকেও ওরা রেহাই দেয়নি, বর্শাবিদ্ধ করেছে। কথাটা বলে একটানে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর বললো– আমি ওদেরকে দেখে নেবো।

*

মিঃ হারুন এবং শংকর রাও নূরসহ এসে হাজির হলেন মাওলানা নিজাম রেয়াজির হোটেলে।

গাড়ি থেকে নামতেই নিজাম রেয়াজি অভ্যর্থনা জানিয়ে এগিয়ে নিলেন। চমকে উঠলেন মাওলানা নিজাম রেয়াজি নূরের মুখে দৃষ্টি পড়তেই।

এটা মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাওয়ের দৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও নূরের দৃষ্টি এড়ালো না। সে ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো মাওলানা নিজাম রেয়াজিকে। অবশ্য মাঝে মাঝে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যাচ্ছিলো উভয়ের।

মিঃ হারুন বললেন চলুন মাওলানা সাহেব, আপনার হোটেলের পেছন অংশে যেখানে এতগুলো হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে সেখানে চলুন। আমরা একটু ভালভাবে তদন্ত করে দেখতে চাই।

মাওলানা সাহেবের মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছিলো নূরকে দেখা মাত্র। এবার মিঃ হারুন যখন হোটেলের পেছন অংশে তদন্ত করে দেখতে চাইলেন তখন তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেন। ভয় হঠাৎ মূল রহস্য না উদঘাটন হয়ে পড়ে।

বললেন নিজাম রেয়াজি–পুলিশপ্রধান নিজে তদন্ত করে দেখেছেন কাজেই পুনরায় তদন্তের কি প্রয়োজন আমি বুঝতে পারছি না।

মন্ত্রীবাহাদুরের ইচ্ছা নয় পুনরায় তদন্ত হোক।

মিঃ হারুন অবহেলা করতে পারেন না, হাজার হলেও মন্ত্রীবাহাদুর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা। মোটেই সমুচিত নয়।

কিন্তু নূর বললো–আমি ঐ স্থান দর্শন করতে চাই, কারণ মন্ত্রীবাহাদুর সাহেবের হোটেলে এমন ঘটনা ঘটবে আর পুলিশমহল সত্যিকারের দোষীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবেন না, এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার।

মিঃ শংকর রাও নূরের কথায় সায় দিয়ে বললেন–হ, মিঃ নুরজ্জামান চৌধুরী যা বললেন সত্য কথা। একবার কেন, প্রয়োজনবোধে আরও বেশি তদন্ত চলতে পারে।

শুধু তদন্তই নয়, আমি হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ করতে চাই। বললো নূর।

মাওলানা নিজাম রেয়াজি মনে মনে রাগান্বিত হলেও বললেন–চলুন। কিন্তু বিদায় মুহূর্তে হোটেলের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন।

ম্যানেজার শুধু মাথা একটু কাৎ করে কিছু ইংগিত করলেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও লক্ষ্য না করলেও লক্ষ্য করলো নূর।

মিঃ হারুন ও মিঃ শংকর রাওয়ের সঙ্গে নূর হোটেলের ভিতর পথে পা বাড়ালো।

যদিও নূর তাগ্রস্ত ছিলো সেদিন তবু আজ তার কিছু কিছু স্মরণে আসছে–এ সেই জায়গা যেখানে তাকে হত্যার জন্য আনা হয়েছিলো। ভয়ংকর চেহারার কয়েকজন লোক, চারপাশে চাপ চাপ রক্ত, মাংসের স্তূপ, তারপর বিরাট আকার একটা দা হাতে দন্ডায়মান এক ব্যক্তি, তার চেহারা এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

মিঃ হারুন এবং শংকর রাওকে মাওলানা নিজাম রেয়াজি সুন্দরভাবে সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবং স্থানটি দেখাচ্ছেন। তার চোখেমুখে একটা রাগত ভাব ফুটে উঠেছে, কারণ নূরকে মাওলানা নিজাম রেয়াজি সহ্য করতে পারছে না। এই তরুণ ডিটেকটিভ অত্যন্ত সুচতুর, তার দৃষ্টি এড়িয়ে ব্যবসা চালানো মুস্কিল হয়ে পড়েছে। তাই অসৎ ব্যবসায়িগণ একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে, তারা ইচ্ছামত চোরাকারবারে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

কান্দাই সরকার জানেন তার লোকেরা সবাই সৎ মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তারা অন্যায় বরদাস্ত করতে পারেন না। তারা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। কাজেই তারা আগুনে পোড়া সোনার মত নির্দোষ। কিন্তু তাদের ভিতরে আছে আর একটা রূপ যে রূপ সহজে ধরা পড়ে না জনসাধারণের চোখে।

জনসাধারণ মনে করে এরাই দেশ ও দেশের মা–বাপ। যখন এসব নেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ন্যায় কথার বুলি আওড়ান তখন জনগণ আহাজারি না করে পারে না, কারণ নেতার ভাব গদগদ কণ্ঠস্বর জনগণের হৃদয়ে ভাবের আবেগ এনে দেয়। বড় মহৎ মহান ব্যক্তি এনারা, জনদরদী বন্ধু….

কিন্তু এরা মানুষ নয়, পশুর চেয়েও অধম বললে ভুল হবে না। যে ব্যক্তিগণ জনগণের চোখে ধূলো দিয়ে নিজেরা গদি আদায় করে বড় বড় ইমার দখল করে বসে আছেন। গেটে অস্ত্রধারী পুলিশ প্রহরী, সরকারি গাড়ি বাড়ি অথচ এক একজন পুরো ব্যবসায়ী। শুধু ব্যবসায়ী নয়, পুরো কালোবাজারী। দেশের

জনগণের সামনে তারা বড় বড় লেকচার দেন, জনগণের মঙ্গল সাধন নিয়ে রাতে তাদের ঘুম হয় না বলেন অথচ তারাই রাতের অন্ধকারে কুকর্ম বেশি করেন।

এহেন ব্যক্তিদের ধোকা দেওয়া জনদরদী ভাষণ কদিন স্থায়ী হবে কে জানে। তবু ওরা বিড়ালতপস্বী সেজে সমাজে নেতৃত্বের আসনে উপবেশন করে ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তুলছেন।

জনগণ প্রথম প্রথম বিশ্বাস করলেও সে বিশ্বাস একদিন বিনষ্ট হয়ে গেছে। তারা এখন বুঝতে শিখেছে আর তারা নীরব থাকতে রাজি নয়, তারা স্বনামধন্য নেতাদের চিনে নিতে পেরেছে। প্রয়োজন হলে ইমারতের চুড়া থেকে টেনে নামাতে তাদের দ্বিধা হবে না কারণ তাদেরকে নানা, বুলি শুনিয়ে আজ নেতা বনে বসেছে তারা যারা সৎ মহৎ ব্যক্তি নামধারী এক একজন নরপশু।

মাওলানা নিজাম রেয়াজি তাদের একজন।

মুখে কাঁচা–পাকা দাড়ি।

পরনে অতি সাদাসিধা পাজামা পাঞ্জাবি।

মাথায় টুপি।

কপালে এবাদতের চিহ্ন।

এটাই হলো সৎ মহত্বের খোলস, ভিতরে রয়েছে মোনাফেকি আবরণ যার উপর বিশ্বাসী। ব্যক্তি।

মাওলানা নিজাম রেয়াজি দেখাচ্ছিলেন সব কিছু কিন্তু যে বন্দীশালায় নূরকে আটকে রাখা হয়েছিলো সেদিকে যাচ্ছেন না রেয়াজি সাহেব।

নূরকে বললো–চলুন ওদিকে একবার দেখা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মাওলানা সাহেব–ওদিকে কোনো কিছু নেই যা আপনাদের কাজে আসতে পারে।

বললেন মিঃ হারুন–চলুন না দেখা যাক।

এবারও নিজাম রেয়াজি ওদিকে যেতে নারাজ হলেন। কিন্তু নূর ছাড়বার বান্দা নয়, সে মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাওকে নিয়ে ওদিকে গেলো।

নিজাম রেয়াজি রাগান্বিতভাবে বললেন–ওদিকে আমার হোটেলের ষ্টোর রুম, কাজেই....

তাতে কি আছে, মিঃ নূর যখন ইচ্ছা প্রকাশ করছেন তখন দেখা যাক। বললেন মিঃ হারুন।

অগত্যা নিজাম রেয়াজি ওদিকে মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং নূরসহ গেলেন।

নুর ঠিক ঐ কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো।

নিজাম রেয়াজি তাকালেন তার একজন কর্মচারীর দিকে।

নূর তালা খোলার নির্দেশ দিলো।

তালা খোলা হলো।

মিঃ হারুন এবং শংকর রাও কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হলেন।

দরজা জানালাবিহীন কক্ষ।

কতকটা ভূগর্ভ কক্ষের মত।

মিঃ হারুন বললেন–এটা কিসের স্যার? আপনি বললেন ষ্টোর রুম কিন্তু কোনো মাল দেখছিনা তো?

নিজাম রেয়াজি জবাব দেওয়ার পূর্বেই বললো নূর–এই কক্ষে একদিন আমাকে আটক করে রাখা হয়েছিলো।

মুহূর্তে মন্ত্রিবাহাদুরের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে আকার ধারণ করলো, ঠিক মৃত ব্যক্তির মত। রক্তশূন্য হলো।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন, তারপর তাকালেন নূরের দিকে।

নূর একটু হেসে বললো–আপনারা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে গেলেন স্যার।

তার মানে? বললেন মিঃ হারুন।

বললো নূর–আমাকে হত্যা করার জন্য এ হোটেলে নিয়ে আসা হয় এবং আমাকে দীর্ঘ সময় আটক করে রাখার পর আমাকে ঐ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় যে স্থানে মাওলানা মন্ত্রিবাহাদুরের কয়েকজন সহচর নিহত হয়

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও হতভম্ব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন নূরকে এমন সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন না, তাঁরা বিশেষ করে মন্ত্রীবাহাদুরের মুখের উপর এমন ধরনের আশ্চর্যজনক উক্তি ....

উভয়ের মুখে কোনও কথা নেই।

স্বনামধন্য মন্ত্রীবাহাদুরের কথা, এ যেন কল্পনাতীত।

মিঃ হারুন বললেন–মিঃ নূর আপনি কি বলছেন ঠিক আমরা বুঝতে পারছি না।

এবার মন্ত্রীবাহাদুর কথা বললেন–স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি আমাকে মিঃ নূর অপরাধী করতে চায়।

নূর ভীষণভাবে অট্টহাসি হেসে উঠলো, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো–অপরাধী আপনি নন, অপরাধী আমি, কারণ আমাকে আইনতভাবে কাজ করতে হচ্ছে নূর হুইসেল বাজালো।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে কান্দাই পুলিশ সুপার এবং আরও কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ দ্রুত সেখানে উপস্থিত হলো। তারা ঘিরে ফেললো মাওলানা নিজাম রেয়াজিকে।

নূর পুলিশপ্রধানকে বললো–ওনাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিন।

পুলিশ সুপার তার সহচর পুলিশ ইন্সপেক্টারকে বললেন–মাওলানা নিজাম রেয়াজি মিঃ নূরকে কৌশলে অপহরণ করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো, সেই অপরাধে আমরা নিজাম, রেয়াজিকে গ্রেপ্তার করলাম।

ততক্ষণে মাওলানা রেয়াজির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন পুলিশ সুপারের সহকারী মিঃ জীমস্।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও একেবারে স্তম্ভিত হতবাক। একি করলেন মিঃ নূর, মন্ত্রীবাহাদুরের হাতে হাতকড়া লাগালেন।

মিঃ হারুন ও মিঃ শংকর রাওয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল নূর–শুধু আমাকে হত্যা করার দায়ে মন্ত্রী বাহাদুরের হাতে হাত কড়া লাগানো হলো না। আরও অপরাধ তিনি করেছেন যার জন্য আইনত তিনি দন্ডনীয়। কান্দাই পুলিশ সুপারের সহকারীকে লক্ষ্য করে বললো নূর–আপনি এনাকে সাবধানে রাখবেন। আসুন মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও, আসুন পুলিশ সুপার, মাওলানা মন্ত্রীবাহাদুরের আরও কিছু কীর্তি রয়েছে দেখবেন।

নূর এগুলো।

ওকে অনুসরন করলেণ পুলিশ অফিসারগণ। সবাই বিস্মিত হয়েছেন নূরের দুঃসাহস লক্ষ্য করে। এসব কি কার্যকলাপ করছেন তিনি।

তবু এগুলেন তাঁরা।

হোটেলের পেছন অংশে আরও দুটি গুদামঘর ছিলো, সেই গুদামঘর দুটি সিঁড়িঘরের আড়ালে ছিলো। নূর ঘর দুটির তালা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলো।

তালা খুলে ফেলতেই অবাক হলেন পুলিশ অফিসারগণ, দেখলেন দেশের এই শোচনীয় মুহূর্তে বিরাট আকার কক্ষ বা গুদামঘর দুটিতে খাদ্যশস্য মজবুত করে রেখেছেন। কান্দাইয়ের প্রায় সমস্ত খাদ্য শস্য মাওলানা নিজাম রেয়াজির গুদামে গুদামজাত করে রাখা হয়েছে। আরও মজুত করে রাখা হয়েছে শিশু খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

দেশের সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মানুষ যখন না খেয়ে ধুকে ধুকে মরছে তখন জনদরদী মহান নেতা মন্ত্রীবাহাদুরদের গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য মজুত

করে রাখা হয়েছে। দেশে এক মহা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছেন।

শুধু মাওলানা মন্ত্রীবাহাদুরই নন, আরও মহান নেতা যারা কান্দাই সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন তারা সবাই প্রায় সাধুবেশী দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারী। অবশ্য জনসাধারণ এ কথা কেউ জানে না। জানে শুধু একজন সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা।

গদি যখন যার হাতের মুঠায় আসে তখন তার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়। একদিন যারা মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাঁরাই তখন হয়ে পড়েন এক একজন লোভী শার্দুলের মত। অর্থ, অর্থের মোহ তাদের অন্ধ করে ফেলে। কিসে তারা কোটি কোটি টাকার মালিক হবেন, কেমন করে তারা গগনচুম্বী ইমার গড়বেন, কেমন করে তারা নুতন ঝকঝকে তিন চারখানা বাড়ি করবেন। দুচারটে ইণ্ডাষ্ট্রির মালিক না হলে; বড় অশোভনীয় দেখায়। সন্তান সন্ততিদের সবাইকে বিদেশে লেখাপড়া না করালে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হয়, অসমাপ্ত থেকে যায় দায়িত্ববোধ। বেচারা দেশদরদী মহান নেতা তারা, সদাসর্বদা দেশ ও জনগণকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী গুণগানকারী তারা, তারা কি যেমন তেমন অবস্থায় থাকতে পারেন। অবশ্য সরকার মাসে সামান্য পাঁচ দশ হাজার টাকা ভাতা হিসেবে দেন। আর যৎসামান্য পান ভ্রমণভাতা, মাসে পনেরো বিশ হাজার–এই সামান্য টাকা গ্রহণ না করলে নয়, তাই তারা করেন। দেশদরদী বন্ধুদের কত দয়া। যদিও বাড়িতে ফটক পেরিয়ে কোনোদিন কোনো অনাথ ব্যক্তি প্রবেশে সক্ষম হয় না, তবুও তারা জনদরদী। হঠাৎ পথে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লে যদি কোনো অনাথ ব্যক্তি হাত পাতে তখন জনদরদী বন্ধু সহানুভূতির সুরে বলেন মাফ কর বাবা। আহা, জনদরদী বন্ধুর কত দয়া–তারা অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে মাফ চেয়ে নেন।

এহেন নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিদের মহত্ত্বের সীমা নেই। এরাই হলেন দেশের স্বনামধন্য মানুষ।

এই মানুষদের যেমন প্রচণ্ড দাপট রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রচণ্ড বাকশক্তি যা জনসাধারণকে যাদুশক্তির মত অভিভূত করে রাখে।

কিন্তু সবেরই শেষ আছে, একদিন এই মহান নেতাদের ভাগ্যে আছে চরম এক অবস্থা যা মনে করলে শিউরে উঠতে হয়। সেদিন তারা মেষশাবকের মত অসহায় হয়ে পড়েন–ভিখারীর মত কাঙ্গাল অবস্থায় করুণা ভিক্ষা করেন দেশের যারা নগণ্য সাধারণ মানুষ তাদের কাছে।

সত্যি সে কথা ভাবলে হাসি পায়।

একদিন যাদের বাড়ির গেটে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী রাজপথের লাইটপোষ্টের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়, একদিন যারা জনদরদী বন্ধুর খোলস পরে জনসাধারণে সালাম গ্রহণ করেন, একদিন যারা পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়ে মঞ্চের প্রধান ব্যক্তির আসনে উপবেশন করেন, সেই ব্যক্তিরাই করুণা ভিক্ষা করেও কারও কাছে এতটুকু করুণা পান না।

খোদার বিচারে তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটবে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে কিন্তু বাস্তব জগতেই এই মহান নেতাদের ভাগ্যে আসে চরম পরিণতি যা ভাবলে শরীরের লোম নূয়ে থাকতে পারে না সজাগ হয়ে উঠে ধমনির রক্ত।

সেদিন কোনো নগণ্য মানুষ এগিয়ে আসেন না এই মহান মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে। অবশ্য তারা আহাজারি না করে পারেন না, কারণ একদিন যারা দুগ্ধফেনিল শয্যায় শয়ন করে সুখনিদ্রায় মগ্ন থাকতেন, যারা খাবার টেবিলে নানাবিধ সুস্বাদু খাবারের স্বাদে পরিতৃপ্ত হতেন, তাঁরা কি করে ঐ সুউচ্চ প্রাচীরে ঘেরা লৌহশেলের অভ্যন্তরে কঠিন মেঝেতে একখানা কম্বলে গা মুড়ি দিয়ে শুকনো কিছু রুটিতে উদরজ্বালা নিবারণ করে অতীতের বেহেস্তের সুখস্বপ্ন অনুভব। করবেন.....

নগণ্য জনসাধারণ এই মহান নেতাদের অবস্থা স্মরণ করে আহাজারি না করে পারেন না কিন্তু তাদের কোনো উপায় থাকে না তখন এই মহান নেতাদের উদ্ধার করার। কারণ যার যেমন কর্ম তেমন তার ফল।

হঠাৎ হেসে উঠলো নূর, বললো–আমার কাজ শেষ হয়েছে স্যার, মাওলানা সাহেবকে পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে নিন।

বললো মিঃ হারুন–একি করছেন মিঃ নূর।

আদালতে এর জবাব পাবেন। তারপর নর পুলিশদেরকে লক্ষ্য করে বললো–হোটেল ঘেরাও করে ফেলুন। একটা কর্মচারীও যেন এ হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।

কথাগুলো বলে নূর পা বাড়ালো গাড়ির দিকে।

মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং পুলিশসহ নুর গাড়িতে উঠে বসলো।

অবশ্য কান্দাই পুলিশ সুপার নিজ গাড়িতে মাওলানা নিজাম রেয়াজিকে নিলেন।

নূর গাড়িতে উঠবার পূর্বে মন্ত্রীবাহাদুরকে লক্ষ্য করে বললো–স্যার, আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, আমি আইন অনুযায়ী কাজ করেছি।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও যেন থ হয়ে পড়েছেন। তারা ভেবে পাচ্ছেন না এ কি করে সম্ভব হলো। মাওলানা নিজাম রেয়াজি তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আর কিনা এই হত্যারহস্যের নায়ক। শুধু তাই নয়, নিজাম রেয়াজি মিঃ নূরকে হরণ করেছিলেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। মিঃ নূর এবার তাদের বুদ্ধিবলকে পরাজিত করলেন। সব যেন কেমন ঘোরালো লাগছে তাঁদের কাছে। নূরের কথায় মাওলনা মন্ত্রীবাহাদুর রাগে ক্ষোভে কেঁপে উঠলেও নীরব থাকতে বাধ্য হলেন, কারণ তিনি জানেন নিজের অপরাধ কতখানি অমার্জনীয়। তাই তিনি নীরব রইলেন বিড়ালতপস্বীর মত।

*

নূরকে বড় উৎফুল্ল লাগছে।

সে মন্ত্রীবাহাদুরকে গ্রেপ্তার করার পর সবে ফিরে এলো নিজ বাসায়।

জামাটা ছুঁড়ে দিলে সে আলনার দিকে। তারপর ফিরে তাকাতেই ড্রাইভার এসে সালাম দিলো।

নূর অবাক গলায় বললো–কি চাও?

ড্রাইভার কোনোদিন সরাসরি তার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করেনি, আজ তাকে হঠাৎ এভাবে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাকালো।

ড্রাইভার কোনো জবাব না দিয়ে নিজের মুখ থেকে দাড়ি–গোঁফ খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে নূর চমকে উঠলো।

বললো ড্রাইভার–নূর, তুমি আজ আমার সন্তানের মতই কাজ করেছো। তুমি জয়ী হয়েছ নূর.....

নূর স্তব্ধকণ্ঠে বলে উঠলো–আব্বু তুমি!

নূর!

নূর ততক্ষণে ছোট্ট শিশুর মতই বনহুরকে জড়িয়ে ধরলো।

পরম আনন্দে আত্মহারা নূর।

কতদিন সে তার আব্বুকে পায়নি এবার তার আব্বুকে সে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছে।

বললো নূর–আব্বু, আমাকে মাফ করে দিয়েছো তো?

বললো বনহুর—-নূর তুমি তো কোনো অন্যায় কাজ করোনি।

নূর তাকালে দেয়ালে টাঙানো তার মায়ের ছবিটির দিকে।

পুত্রের দৃষ্টির সঙ্গে বনহুর দৃষ্টি মিলিয়ে মনিরার দিকে তাকালো।

হাসছে মনিরা।

স্বামী এবং পুত্রের মিলনে সে হাসি যেন অপূর্ব লাগছে। চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বনহুর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেইদিকে।

নূরের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো বনহুরের।

নূর বললো–আব্বু তুমি আসবে জানতাম। আরও জানতাম তোমার মৃত্যু হয়নি।

নূর!

হা আব্বু।

তুমি বড় সাহসী হবে, এটা আমি জানতাম। আজ তুমি মাওলানা নিজাম রেয়াজিকে প্রকাশ্যে গ্রেপ্তার করে তা প্রমাণ করেছে।

আব্বু।

সরকারের লোক হলেও তাকে ক্ষমা করা উচিত নয়, কারণ অন্যায় কাজ করার অধিকার কারও নেই। নূর, আমি বহুদিন পূর্বে তাকে সায়েস্তা করতে পারতাম কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তুমি বিদেশ থেকে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ হয়ে এসেছে। পারো কিনা এই দেশদরদী বন্ধু মুখোশধারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে। নূর, আজ আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি....

তোমার দোয়া আমার চলার পথের পাথেয় আব্বু।

দরজার বাইরে কারও পদশব্দ শোনা যায়।

বনহুর বলে—-আমি এবার চলি। আবার দেখা হবে কথাটা বলে পাশের দরজা দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে যায় বনহুর।

কক্ষে প্রবেশ করে বাবুর্চি–সাহেব, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা যাও, আমি আসছি। বললো নূর।

বাবুর্চি চলে গেলো।

নূর ছুটে গেলো যে পথে তার আব্বু চলে গেছে সেই দিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো, অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়লো না, শুধু থৈ থৈ অন্ধকার।

নূর ফিরে এলো খাটের পাশে।

খাটে বসে জুতোর ফিতে খুলছে আর ভাবছে তার আব্বুর কথা। একদিন আব্বুকে নূর প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসতো, আব্বুর কণ্ঠস্বর, হাসি, কথা বলার ভঙ্গি সব তাকে অভিভূত করতো, শ্রদ্ধা করতো নূর তাকে অন্তর দিয়ে কিন্তু যখন নূর জানতে পারলো স্বয়ং দস্যু বনহুরই তার সেই দেবপুরুষ পিতা–... এত ব্যথা বুঝি সে কোনোদিন পায়নি সেদিন যে ব্যথা সে পেয়েছিলো। শুধু ব্যথাই নয়, একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলো নূর, সে যেন এই জগতেই ছিলো না সেদিন, ভাবতে

পারেনি তার সেই আব্বু সাধারণ মানুষ নন–একজন ডাকু, একজন দস্যু যে দস্যুকে গ্রেপ্তার করার জন্য সে শপথ গ্রহণ করেছিলো সেই দস্যু বনহুর তারই আব্বু ভেঙে পড়েছিলো নূর। আজ আবার সেই পিতার রূপ নতুনভাবে ধরা পড়ে তার কাছে। মনে হয় তার আব্বুর মত বুঝি এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই, কেউ হয় না। হঠাৎ মনের এ পরিবর্তন কেন তা সে নিজেও যেন বুঝতে পারে না। সত্যি আজ সে নিজকে ধন্য বলে মনে করে, তার আব্বু এক অস্বাভাবিক পুরুষ।

এদিকে নূরের মনে যখন নানা চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে, তখন বাবুর্চি বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো, টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া। হঠাৎ একটা শব্দ হলো।

নূর চমকে ফিরে তাকালো, একটা কালো বিড়াল জানালা টপকে বেরিয়ে গেলো।

নূর সজাগ হয়ে খাবার টেবিলের দিকে পা বাড়ালো।

দূর কোনো গীর্জা থেকে ভেসে এলো রাত বারোটা বাজার সংকেতধ্বনি।

*

প্রচণ্ড খরায় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

জমিতে ফসল নেই।

চাষীর মুখের হাসি শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে।

সমস্ত কান্দাই শহরে ভীষণ আকার মহামারী দেখা দিয়েছে। চারদিকে শুধু হাহাকার। জনসাধারণের অবস্থা দুর্বিসহ। ক্ষুধার জ্বালায় দেশে কান্নার রোল পড়ে গেছে।

পরনে অনেকের বস্ত্র নেই।

চেহারা কংকালসার হয়ে গেছে।

চোখ কোটরাগত।

চুলে জটা ধরেছে, কতদিন মাথায় তেল পড়ে না।

কান্দাইয়ের অবস্থা শোচনীয়।

বহুদিন বনহুর কান্দাই ছিলো না, এ কারণেই আজ কান্দাইবাসীর এ অবস্থা।

তারপর দীর্ঘ দুবছর ধরে দেশে দুর্ভিক্ষ চলেছে।

মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

যারা এতদিন না চাইতেই পেয়ে এসেছে তারা আর পায় না। কেউ তাদের অর্থ দিয়ে বা খাদ্য দিয়ে সাহায্য করে না। অসুস্থ হলে কেউ ওষুধ দিয়ে উপকারে করে না। সেই জমকালো পোশাকপরা মানুষটা দেবদূতের মত আর এগিয়ে আসে না। বস্তির কুড়েঘরে আর শোনা যায় না সেই ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

বৃদ্ধরা চোখের পানি ফেলে।

তরুণরা ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

কিশোর যারা, তারা হাতের পিঠে চোখ মোছে।

কান্দাই ছোট্ট দেশ নয়।

বৃহৎ এক দেশ কান্দাই।

কোটি কোটি টাকা আর খাদ্য হলে তবে কোনো রকমে শুধু অনাহার ব্যক্তিদের যৎসামান্য উপকার করা সম্ভব হবে বা হতে পারে।

বনহুর দরবারে বসার পর তার কাছে অনুচরগণ সংবাদ পরিবেশন করলো।

ঐ মুহূর্তে রহমান ছিলো না, সে হাজির হলো সবশেষে। তার দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর–কি সংবাদ রহমান?

রহমান বললো–সর্দার, কান্দাই শহরে মহা দুর্ভিক্ষ আর মহামারী দেখা দিয়েছে।

হাঁ, সব শুনলাম এবং কদিন নিজেও অনেক কিছু সংবাদ জানতে পেরেছি। তা ছাড়া আমার গা ঢাকা দেবার একমাত্র কারণ ছিলো, আমি গোপনে দেশের অবস্থা পরিদর্শন করবো।

সর্দার, আমরাও ঘাবড়ে পড়িনি, কারণ আমরাও জানতাম আপনার মৃত্যু ঘটেনি এবং এ কারণেই...

বললো বনহুর–জানতাম তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করে যাবে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না দুর্নীতিবাজগণ কি করে এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারলো?

সর্দার, আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এ ব্যাপারে।

আমি আশা করিনি আমার অবর্তমানে দেশ এমন এক চরম অবস্থায় দাঁড়াবে। তোমাদের ব্যর্থতা আমাকে ভীষণ আঘাত দিয়েছে।

সর্দার। বললো রহমান।

বনহুর বললো–যেদিন তোমরা পাঙ্গুইন শহরে দুর্গতদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করছিলে সেদিন আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।

সর্দার, আপনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। অবাক কণ্ঠে বললো– রহমান।

বনহুর বললো–হাঁ। সেদিন আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি তোমাদের কাজে। ভেবেছিলাম আমার অবর্তমানে তোমরা ঠিকভাবেই আমার অসমাপ্ত কাজ সমাধা করে যাবে। কিন্তু.....

সর্দার, আমরা ভেবে পাচ্ছি না আপনি কখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং কি ভাবে ছিলেন? বললো কায়েস।

রহমানও বললো–হা সর্দার, বড় অবাক লাগছে যে আমরাও আপনাকে চিনতে পারিনি।

এবার হেসে বললো বনহুর– তোমাদের গাড়িতেই ছিলাম ড্রাইভারের আসনে।

সর্দার।

হাঁ, রহমান।

কিন্তু আমরা আপনাকে মানে ড্রাইভারকে তিরস্কার করেছিলাম তার আসতে বিলম্ব হওয়ার জন্য....

তাতে আমি খুশি হয়েছিলাম। ভয় পাবার কিছু নেই। যাক সে কথা এখন দেশে মানে কান্দাইয়ে যে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তাতে আমাদের কিভাবে সাহায্য করা হচ্ছে তাই জানতে চাই?

রহমান বললো–প্রতিদিন যে হারে অর্থ এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যয় হচ্ছে তাতে আমাদের ধনাগারে যা জমা আছে তা বেশিদিন চলবে বলে মনে হয় না।

যতক্ষণ চলে চলতে দাও।

সর্দার, অনেকদিন হতে ধনাগারে কোন ধনরত্ন জমা হচ্ছে না

তার কারণ সংগ্রহ হয়নি, এই তো?

সর্দার আপনার নির্দেশে আমরা...

নিশ্চুপ রয়েছে।

এক রকম তাই।

ভাল কথা, আমি চাই না অহেতুক কারও উপর তোমরা আক্রমণ চালাও।

কিন্তু সর্দার, এভাবে শুধু দান করে গেলে আর কতদিন ধনভাণ্ডার পূর্ণ থাকবে। কথাটা বললো ইলিয়াস।

ধনভাণ্ডার পূর্ব থাকার প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ আমার ধনভাণ্ডারে একটা পয়সা অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ একটা অসহায় মানুষ যেন না খেয়ে ধুকে ধুকে না মরে।

রহমান।

বলুন সর্দার।

আমি দস্যু… হৃদয়হীন পাষণ্ড নরপিশাচ, অনেকের মুখে অনেক কথা শুনেছি, কেউ আমাকে বুঝতে চেষ্টা করেনি। যাক, তাতে আমার দুঃখ নেই, কারণ সবাই আমাকে যা খুশি তাই বলুক তবু আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। মংগল দ্বীপে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তাই অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তোমরা কালই চলে যাবে।

আচ্ছা সর্দার। কিন্তু…

বলো?

সর্দার ধনভাণ্ডার

শূন্য প্রায়?

হাঁ সর্দার।

সে চিন্তা তোমরা করো না। এত ধনরত্নের সন্ধান আমি পেয়েছি যা যুগ যুগ ধরে বিলালেও শেষ হবে না।

সর্দার।

হাঁ, রহমান।

তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত?

নিশ্চয়ই।

তোমরা কাজ করে যাও। অর্থের বা খাদ্যের জন্য কিছু ভেবো না। বনহুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

সেদিনের মত দরবার শেষ হলো।

বনহুর বেরিয়ে আসতেই সরে দাঁড়ালো ফুল্লরা।

বললো বনহুর– ফুল্লরা শোন।

ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো বনহুরের সামনে।

বনহুর ফুল্লরার চিবুকটা উঁচু করে ধরে।

লজ্জায় মাথাটা নিচু করে ফেললো ফুল্লরা। কারণ সর্দারের সঙ্গে তার বহুদিন পর সাক্ষালাভ ঘটলো।

বললো বনহুর–ফুল্লরা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ।

শুধু বড় হয়নি বড় সুন্দর হয়েছে ও! বললো নূরী।

হাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ফুল্লরা, তোমার নীলপাথর হীরার হার কোথায়?

এবার ফুল্লরা জামার ভিতর থেকে নীর পাথর, হীরার হারটি বের করে বললো–আমি এটাকে যত্ন করে রেখেছি সর্দার।

বনহুর হেসে বললো–চমৎকার।

কিন্তু… বললো নূরী।

বলে থামলে কেন?

নূরী বললো–ফুল্লরা বড় হয়েছে, এবার ওর বিয়ের কথা ভাবতে হয়।

ফুল্লরা ছুটে পালিয়ে গেলো।

হাসলো বনহুর।

নূর বললো–জাভেদ বড় হয়েছে, ওদের দুজনকে মানাবে ভাল।

হা তাই হবে, জাভেদ আর ফুল্লরাকে নিয়ে তুমি যা ভাবছো, তাই হবে

সত্যি তুমি মত দিচ্ছো?

আমি মত দেবার পূর্বেই তোমার মত হয়ে গেছে, কাজেই আমি

তুমি তো সব সময় সবকিছু এড়িয়ে চল।

নূরী, তুমি আছো বলেই আমার ভরসা, কিছু ভাবতে হয় না আমার। এসো নূরী… বনহুর নূরীর হাত ধরে নিয়ে এগুলো আস্তানার ভিতরে।

বললো নূরী–এখনও তুমি কি পূর্বের সেই হুর আছো?

তোমার কি মনে হয়?

বিশ্রামকক্ষ।

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। বহুদিন সে এমন করে নূরীকে কাছে পায়নি, আজ কিন্তু নতুন এক রূপ নিয়ে বনহুর নুরীর জীবনে হাজির হয়েছে। শুধু জানতো রহমান বনহুর জীবিত আছে, আর কেউ এ কথা জানতো না। এমন কি নূরীও না।

সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ নূরীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো কেউ তার কক্ষে মানে গুহায় প্রবেশ করলো বলে মনে হলো। নূরীর বুকটা ধক করে উঠেছিলো। একবার মনে করলে হয়তো জাভেদ এসেছে তার কক্ষে কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো জাভেদ তো এভাবে কোনোদিন আসে না, বিশেষ করে গভীর রাতে নুরী চোখ মেলতেই চমকে উঠলো জমকালো পোশাকপরা কেউ এসে দাঁড়ালো তার শিয়রে।

নূরীর ললাটে একটা নিঃশ্বাসের প্রলেপ লাগলো। বলে উঠলো নূরী—-কে, কে তুমি?

চুপ করো, আমি।

তুমি, তুমি এসেছো শুর? আমি জানতাম তুমি মরোনি, মরতে পারো না।

তাহলে কি আমি চিরজীবি হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবো। নুরী… বনহুর নূরীকে টেনে নিয়েছিলো গভীর আবেগে।

বনহুর নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিলো বিশেষ কিছু কারণে। নূরের কাছে সে নিজেকে মৃত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলো এবং পুলিশমহলের কাছেও বটে এবং যারা দেশের দুর্নীতিবাজ তাদের কাছেও। আত্মগোপন করার পর বেশ কিছুদিন অজ্ঞাত থেকে বনহুর সন্ধান নিয়েছে, নূর কেমনভাবে কাজ করছে। পুলিশমহলের অবস্থা কেমন, কান্দাইয়ের কোন্ স্থানে কেমনভাবে

দুর্নীতিবাজরা আসর জমিয়ে বসেছে, কান্দাই সরকার যে সব মহান ব্যক্তিদের পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন সেই স্বনামধন্য ব্যক্তিরা কিভাবে কাজ করছেন, তারা কি সত্যিকারের দেশ দরদী না বিড়ালতপস্বী। এ ছাড়াও বনহুর নিজেকে সরিয়ে রেখে নিজের আস্তানার সন্ধান রেখেছিলো তারা কিভাবে কাজ করে চলেছে।

সন্ধান নেওয়া তার শেষ হয়ে গেছে।

এবার সে আত্মপ্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেনি, তবে পুলিশমহলের কাছে সে এখনও মৃত। তারাই শুধু নয়, জনসাধারণও জানে বনহুর নেই।

দুর্নীতিবাজ আর দুষ্কৃতিকারিগণ রামরাজত্ব পেয়ে বসেছে, পুলিশমহলের চোখে ধূলা দিয়ে তারা জনসাধারণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের উদর পূরণ করছে। বনহুর সব সন্ধান নিয়ে জেনে নিয়েছে, এবার সায়েস্তা করার জন্য প্রস্তুত সে।

আস্তানায় ফিরে এলেও শহরবাসিগণ জানে বনহুর জীবিত নেই। এমন কি যারা বনহুরের হিতাকাঙ্ক্ষী তারাও এটা স্বীকার করে নিয়েছে এবং ব্যথিত মর্মাহত হয়েছে। অনেকে চোখের পানি ফেলেছে এবং আজও তারা চোখের পানি ফেলছে।

বনহুর যে তাদের পরম বন্ধু ছিলো।

সেদিন হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো।

প্রকৃতি যেন ভীষণ ক্ষেপে গেছে। নীল আকাশ ছেয়ে গেছে জমাট মেঘে।

ঝড়ো হাওয়া বইছে এলোপাতাড়ি।

তার সঙ্গে মেঘের গর্জন।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

বনহুর একটা বড় নৌকায় কিছু খাদ্যশস্য নিয়ে কয়েকজন অনুচরসহ যাচ্ছিলো ফাংহা দ্বীপে।

হঠাৎ তাদের নৌকা ঝড়ের মুখে পড়ে গেলো।

বনহুরের দেহেও মাঝির বেশ।

তার অনুচরগণও মাঝিবেশে নৌকা চালিয়ে চলেছিলো।

ঝড় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর মাঝিদের লক্ষ্য করে বললো– তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে নৌকা চালাও, যে কোনো মুহূর্তে নৌকাখানা উল্টে যেতে পারে। বনহুর নিজেও নৌকার হাল চেপে ধরলো মজবুত করে।

এমন সময় তারা দেখলো দুরে একখানা নৌকা এগিয়ে আসছে। ঠিক নৌকা নয়–বজরা বলা যায়।

বনহুর সেদিকে লক্ষ্য করে বললো–ঐ বজরাখানাও ঝড়ে বিপদগ্রস্ত ঠিক আমাদের মত।

হ্যাঁ সর্দার, তাই দেখছি।

সাঁ সাঁ করে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না।

এমনকি কিছু চোখেও দেখা যাচ্ছে না। বনহুর স্বয়ং হাল এঁটে ধরে আছে বলেই নৌকাখানা এতক্ষণ পানিতে ভেসে আছে বলা যায়।

প্রচণ্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে নৌকার উপর।

এ ধরণের ঝড়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলো বনহুর, সে মোটেই ঘাবড়ে গেলো না। শক্ত করে হাল ধরে নৌকা ও নৌকায় যে খাদ্যদ্রব্য ছিলো রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো।

সেই মুহূর্তে বজরাখানা একেবারে নিকটে এসে পড়ে এবং একজন তরুণী ঝাঁপিয়ে পড়লো বজরা থেকে পানিতে।

সঙ্গে সঙ্গে বজরার উপরে আরও কয়েকজন পুরুষ মহা হৈ চৈ শুরু করে দিলো।

যদিও তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিলো না তবুও দেখা যাচ্ছে বজরার উপরে কতগুলো লোক উত্তেজিতভাবে ছুটাছুটি করছে।

বনহুর লক্ষ্য করে স্থির থাকতে পারলো না। সে ঐ ঝড়ের মধ্যেই লাফিয়ে পড়লো নদীবক্ষে বজরাখারা ততক্ষণে অনেক দূর ভেসে গেছে।

সর্দার নদীগর্তে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুচরগণ নৌকাখানিকে স্থির করে ধরে রাখার চেষ্টা করলো।

বনহুর তখন সাঁতার কেটে চলেছে ঐ তরুণী যে একটু পূর্বে বজরা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো সেইদিকে। যদিও ঝড়ের তাণ্ডব লীলা তখনও ভীষণ বেগে চলছে।

বনহুর ঠিক দেখতে না পেলেও সে ঠিকই তরুণীটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো। ওদিকে নৌকাখানাকে মোটেই ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিলো না। বনহুরের অনুচরগণ হিমসিম খেয়ে। যাচ্ছে। তবুও তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

বনহুর শেষ অবধি তরুণীটির কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেলো এবং ধরে ফেললো তাকে।

অনেক কষ্টে তরুণীকে তুলে ধরে সাঁতার কাটতে লাগলো এবং নৌকাখানার দিকে এগুতে চেষ্টা করলো।

ওদিকে বজরাখানা তখনও অনেক দূরে সরে গেছে। ঝড়ের তাণ্ডবলীলা তখনও কমেনি। নৌকাখানাকে বনহুরের অনুচরদের এদিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত কঠিনভাবে তারা সংগ্রাম করছে।

শেষ পর্যন্ত বনহুর ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নৌকাটির কাছাকাছি এসে পড়লো।

কয়েকজন অনুচর রশি ছুঁড়ে দিলো বনহুরের দিকে।

বনহুর এক হাতে তরুণীটিকে ধরে অপর হাতে রশিটা ধরে ফেললো এবং কৌশলে উঠে, পড়লো সে তরুণীসহ নৌকাখানার উপরে।

নৌকাখানা ঐ মুহূর্তে উল্টে যাবার উপক্রম হলো।

বনহুর তরুণীটাকে নৌকার উপরে তুলে নিয়েই শুইয়ে দিলো, তারপর দ্রুত গিয়ে শক্ত করে ধরে ফেললো নৌকার হাল।

উল্টে যেতে যেতে রক্ষা পেলো নৌকাখানা।

এবার নৌকাখানাকে প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে কিছুটা এগিয়ে নিতে সক্ষম হলো বনহুরের অনুচরগণ।

তারপর একসময় ঝড়ের বেগ কমে এলো।

আকাশ মেঘমুক্ত না হলেও কিছুটা হাল্কা হয়ে এসেছে।

এক সময় ঝড় সম্পূর্ণ থেমে গেলো।

এবার বনহুর হাল ছেড়ে এলো তরুণীটার দিকে। তরুণীর সংজ্ঞা ফিরে আসেনি তখনও। তার ভিজে বসন শরীরে লেপটে আছে।

বনহুর তার একজন অনুচরকে বলালো–ওর শরীরে একটা চাদর ঢাকা দাও।

অনুচরটা চাদর এনে চাপা দিলো।

বনহুর বললো–তোমরা নৌকাখানাকে তীরে ভিড়াও। তরুণীটাকে ভালভাবে লক্ষ্য করা দরকার। ওর জ্ঞান ফিরে না আসা অবধি আমরা ফাংহা দ্বীপে যেতে পারি না।

আচ্ছা সর্দার। বললো অনুচরদের একজন।

নৌকাখানাকে তীরের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করলো ওরা।

এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তীরে পৌঁছে গেলো।

নৌকাখানা তীরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর তরুণীর পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো এবং হাতখানা তুলে নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলো। কিছু সময়েই সংজ্ঞালাভ করবে তাতে কোনো সন্দেহ। নেই।

ভিজে কাপড়ে তরুণীর শরীরের অবস্থা খারাপ হতে পারে তবু পাল্টানো সম্ভব হলো না। নৌকায় ছিলো কিছু দুধ তাও ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় পড়ে গেছে।

বনহুরের অনুচরগণ কিছু ফল নিয়েছিলো সঙ্গে, কারণ সর্দার ফল ছাড়া তেমন কিছু খান না তাই। এবার সেই ফল থেকে কিছু রস নিয়ে তরুণীর মুখে দেওয়া হলো।

অল্প সময়ে সংজ্ঞা ফিরে এলো তরুণীর, সে বললো–আমি কোথায়?

বললো বনহুর–আপনি একটু সুস্থ হলে সব জানতে পারবেন।

তরুণীটি নীরবে চোখ বুজলো।

বনহুর একজন অনুচরকে লক্ষ্য করে বললো–তোমরা এখন বিশ্রামের আয়োজন করো, আমরা কিছু সময় বিশ্রাম করার পর পুনরায় ফাংহা দ্বীপ অভিমুখে রওয়ানা দেব।

সর্দারের নির্দেশমত অনুচরগণ বিশ্রামের আয়োজন করলো।

বহুক্ষণ তারা ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে এবার তারা নিশ্চিন্তভাবে হাত-পা ছড়িয়ে বসলো।

যখন সব অনুচরগণ তীরে নেমে বিশ্রাম করছে তখন বনহুর এসে তরুণীর পাশে বসলো।

চোখ মেলে তাকালো তরুণী।

বনহুর বললো–এখন কেমন বোধ করছেন?

তরুণী বললো–অনেকটা ভাল।

পাশের গেলাসটা তুলে নিয়ে বললো বনহুর–তাহলে ফলের রসটুকু পান করে নিন।

না, আমি কিছু খাবো না। বলুন আপনি কে? বললো তরুণী।

বনহুর বললো–আমি একজন মাঝি।

মিছে কথা বলছেন আপনি।

কি রকম?

আপনার পোশাক যদিও মাঝিদের মত কিন্তু আপনি সত্যি মাঝি নন।

আপনার এমন ধারণার কারণ কি?

আপনার চেহারা মোটেই মাঝি বলে আপনাকে প্রমাণ করে না। এবার তরুণী নৌকার মধ্যে উঠে বসলো। বললো–সত্যি করে বলুন আপনি কে?

তার পূর্বে বলুন আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি আপনি স্বইচ্ছায় নৌকা থেকে লাফিয়ে নদীবক্ষে পড়েছেন।

হাঁ।

আশ্চর্য, এই ভীষণ ঝড়ে কেউ নদীবুকে লাফিয়ে পড়ে? আপনি দেখছি চরম সাহসী মেয়ে...

আপনি যেই হোন না কেন, আমার জীবন রক্ষাকারী আপনি, কাজেই যা আমার ভাগ্যে থাকে ঘটবে তবু আমি সবকথা আপনাকে না বলে পারবো না।

বলুন যদি কোনো সমাধান হয় বা করতে পারি।

আমি কান্দাইবাসী মিঃ গরসের একমাত্র কন্যা। নাম আমার মিস সোমা গরসে....

আপনি সেই বিশ্বখ্যাত অশ্বারোহী মিস সোমা গরসে?

হাঁ।

আপনার এ অবস্থা কেন? অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করে বজরাপৃষ্ঠে আরোহণ তার মানে?

আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে বজরায় নিয়ে নদীপথ ভ্রমণে আসে। আমিও তাদের বিশ্বাস করি এবং তাদের সঙ্গে চলে আসি।

হু। তারপর?

তারা আমাকে নিয়ে বহু দূর চলে আসে। প্রথমে আমি বুঝতেই পারিনি তাদের মনে কোন কুমতলব আছে। তারপর তারা আমাকে নিজেদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আমি তখন তাদের কথায় ভীষণ রাগ করি এবং আমি ফিরে যাবার জন্য রাগারাগি করি। তখন ওরা আমাকে জোরপূর্বক আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। ঠিক ঐ সময় ঝড়ের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। বজরাখানা ভয়ংকরভাবে টলতে থাকে। আমার সেই জঘন্য বন্ধুমহল তখন আমাকে ত্যাগ করে। বজরাখানাকে ঝড়ের বেগ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। আমি সেই মুহূর্তে নদীবক্ষে ঝাঁপ দেই…

আপনি জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন?

এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না।

আপনার জীবনকে আপনি এতখানি তুচ্ছ মনে করলেন?

আপনি পুরুষ মানুষ তাই এ কথা বলছেন। নারীর জীবনের চেয়ে ইজ্জতের মূল্য অনেক বেশি…

মিস সোমা, আপনি সত্যি প্রশংসার পাত্রী। আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পেরে গর্বিত। বললো বনহুর।

মিস সোমা মাথা নিচু করে রইলো।

মাথা নিচু করবার পূর্বে সে তাকালো একবার বনহুরের চোখের দিকে। অদ্ভুত সে চোখ। এমন চোখ এবং পৌরুষদীপ্ত চেহারা মিস সোমা এই প্রথম দেখলো।

নতুন এক মানুষ।

সাধারণ মাঝির বেশেও বনহুরকে অদ্ভুত লাগছে। বয়স তার কম হয়নি তবু তার বলিষ্ঠ চেহারার একটুও সৌন্দর্য কমেনি।

মিস সোমা আবার চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুরের দিকে।

একটু হেসে বললো বনহুর–আর কোনো ভয় নেই মিস সোমা। আপনাকে আপনার পিতা মাতার নিকটে পৌঁছে দেবো।

এবার মিস সোমা বললো–আপনি কে? নিশ্চয়ই কোনো মহান ব্যক্তি।

আপনাকে পানি থেকেতুলতে সক্ষম হয়েছি বলেই আমি মহান হলাম? হাসলো বনহুর।

মিস সোমার বয়স হয়েছে, সে শিক্ষিতা জ্ঞান সম্পন্না মহিলা বলা যায়, বনহুরকে সে একজন সাধারণ মানুষ বলে ভাবতে পারলো না। তার যে অন্য কোন পরিচয় আছে এটা ঠিক মনে করলো মিস সোমা।

বললো–আমার কাছে আপনার পরিচয় গোপন করার কিছু নেই। আরও একটা কথা আমি বলতে চাই আপনি মাঝি নন.... কিন্তু কে আপনি কি আপনার পরিচয়?

পূর্বের মতই হেসে বললো বনহুর–সব বলবো কিন্তু আজ নয়। আপনি দেখছেন আমার এ নৌকা বোঝাই রয়েছে খাদ্যদ্রব্য। আমি বা আমরা চলেছি ফাংহা দ্বীপে। সেখানে মানুষ খাদ্যের অভাবে মৃতের ন্যায় হয়ে পড়েছে। আমি চাই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং কাজ শেষ হলে আপনাকে আমরা পৌঁছে দেবো আপনার মা–বাবা কাছে। বলুন রাজি?

বললো মিস সোমা আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন–কাজেই

আমি যা বলবো তাই রাজি? হেসে বললো বনহুর।

বললো সোমা–হ্যাঁ। জানি আপনি আমার অমঙ্গল চিন্তা করবেন না।

বেশ, এই বিশ্বাস যেন অটুট থাকে।

কথাটা বলে বনহুর তখন বেরিয়ে গেলো।

সর্দার অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো–এবার তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। রওয়ানা দিতে হবে।

অনুচরগণ সবাই এবার সজাগ হয়ে উঠে পড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বজরা ছাড়লো।

ফাংহা দ্বীপ অভিমুখে এগিয়ে চললো নৌকাখানা। ঘণ্টাকয়েক চলার পর হঠাৎ তাদের নজরে পড়লো সেই বজরাখানা এগিয়ে আসছে।

বনহুর অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো–তোমরাও নৌকাখানাকে এগিয়ে নাও। ঐ সেই বজরা।

হাঁ সর্দার।

বললো বনহুর–নৌকাখানাকে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে চলো যাতে বজরার ওরা বুঝতে না পারে তোমরাও ওদের দিকে এগুচ্ছো।

সর্দার?

জানি তোমরা প্রস্তুত হবে কি না ভাবছো?

হাঁ সর্দার।

ঐ তরুণীটার সম্বন্ধে সব কথা বলেছি তোমাদের কাছে। কারণ না বললে তোমরা এত সহজে আমার ইংগিত বুঝতে না, কাজেই তোমাদের সব জানা আছে। ওরা বজরা নিয়ে আমাদের আক্রমণ চালাবে মনে করেই এগিয়ে আসছে। যদিও ওরা একেবারে সঠিক জানে না তাদের শিকার আমাদের নৌকায় আছে।

বললো একজন–সর্দার, ওরা জানে বলে মনে হচ্ছে, কারণ আপনি যখন তরুণীটাকে নিয়ে আমাদের নৌকার নিকটবর্তী হচ্ছিলেন তখন বজরাখানা যদিও অনেক দূরে চলে গিয়েছিলো তবুও বজরার পেছন অংশে কয়েকজন দূরবীক্ষণ যন্ত্র হাতে ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলো বলে লক্ষ্য করেছিলাম।

বললো বনহুর—-ঐ ভীষণ ঝড়ের মধ্যে এতখানি লক্ষ্য করবার মত মনোভাব ছিলো তোমার?

ছিলো সর্দার, কারণ বজরাখানা থেকেই তরুণীটা নদীবক্ষে পড়ে গিয়েছিলো, তাই তারা হয়তো আমাদের লক্ষ্য করে বলে আমাদের ধারণা–তাই আমিও

ভালভাবে খেয়াল করছিলাম।

ওঃ এবার বুঝেছি–সেই কারণেই তারা ঝড় থেমে গেলেও আমাদের নৌকার সন্ধান করছিলো। বনহুর কথাগুলো বলে তাকালো বজরাখানার দিকে।

বজরাখানা এগিয়ে আসছে।

বজরার ছাদে কয়েকজন যুবক.এবং দুএকজন মাঝবয়সী লোক দূরবীক্ষণ যন্ত্র হাতে তাদের নৌকার দিকে আংগুল দিয়ে কিছু দেখাচ্ছে।

বনহুর একটু হাসলো।

অনুচরগণ তাদের নিজ নিজ অস্ত্র প্রস্তুত করে নিলো।

বনহুর বললো–ওদের নিকটে কোনো অস্ত্র নেই, কাজেই তোমরাও অস্ত্র ব্যবহার করো না।

তাহলে সর্দার আমরা....

আমি জানি তোমাদের বলিষ্ঠ হাতগুলোই এক–একটা অস্ত্র। এ অস্ত্র ব্যবহার করলেই চলবে।

আচ্ছা সর্দার।

ততক্ষণে বজরাখানা কাছাকাছি এসে গেছে। ওরা জানে না এ নৌকাটা কার এবং এ নৌকায় কে আছে। জানে না বলেই ওরা অগ্রসর হচ্ছে, জানলে এগুনো তো দূরের কথা, তাদের দৃষ্টির সীমানাই আসতো না।

বজরাখানা একেবারে নিকটে এসে পড়েছে।

সবাইকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বনহুর আর মিস সোমা নৌকার ছৈয়ের মধ্যে থেকে লক্ষ্য করছিলো।

বললো সোমা–ওরাই আমাকে বন্ধু সেজে নিয়ে এসেছিলো।

ওদের আপনি চেনেন মানে সবাইকে চেনেন কি?

প্রায়ই চিনি। আমরা একসঙ্গে পড়াশুনা করছি, তারপর ঘোড় দৌড়ে ওরা আমার সঙ্গে রেস পাল্লা দিয়েছে। সবাই প্রায় স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সন্তান।

তাহলে পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিলো।

নাহলে কি আমি ওদের সঙ্গে আসতাম, কিন্তু ওরা যে বন্ধুবেশী শয়তান তা জানতাম না।

মিস সোমা, আপনি তাহলে নৌকার ছৈয়ের মধ্যে অপেক্ষা করুন, আমি বাইরে ওদের সংগে মোকাবেলা করে আসি।

মিস সোমা কোনো জবাব দেবার পূর্বে বেরিয়ে গেলো বনহুর।

বজরাখানা নৌকায় লাগিয়ে দিয়েছে ওরা, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো কয়েকজন যুবক।

বনহুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। সে দেখলো যুবদল সবাই শিক্ষিত এবং ধনবানের সন্তান। সবার চেহারার মধ্যে একটা আভিজাত্য ছাপ বিদ্যমান।

মনে মনে হাসলো বনহুর, হায়রে ভদ্রবেশী পিতামাতার নরপশু সন্তান। যে বাবা–মা সন্তানদেরকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেনি না, তারা আবার দেশের জনদরদী নেতা। এরা স্বনামধন্য ব্যক্তিদের এক একজন গুণধর সন্তান।

ততক্ষণে ভীষণ মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

যুবকদের হাতে লোহার রড অথবা ঐ ধরনের কিছু বস্তু ছিলো।

আর বনহুরের মাঝিবেশী অনুচরদের হাত শূন্য। তারা মল্লযুদ্ধ মানে হাত দিয়ে যুদ্ধ শুরু করলো।

প্রচণ্ড এক এক ঘুষিতে এক একজনকে ধরাশায়ী করে চললো বনহুরের অনুচরগণ। নাকে মুখে রক্ত গড়িয়ে পড়লো ওদের, হাজার হলেও ওরা শক্তিশালী

মোটেই নয়। ওরা সাধারণ তরুণ, কাজেই তারা মারপিটের কায়দা কৌশলও তেমন জানে না।

বনহুরের অনুচরগণ অল্পক্ষণেই বজরা থেকে যে তরুণগণ আচমকা আক্রমণ করেছিলো, তাদের চোখেমুখে রক্তপাত করে ছাড়লো। অনেকে পড়ে গেলো পানিতে।

তারা প্রাণপণে সাঁতার কেটে বজরা অভিমুখে পালাতে লাগলো। তাদের কারও আর ফিরে তাকিয়ে দেখবার সাহস হলো না নৌকাখানার দিকে।

বনহুরের একজন অনুচরর মাথায় হঠাৎ করে একজন রডের আঘাত করলো।

পড়ে গেলো অনুচরটা।

রক্তরাঙা হয়ে উঠলো বজরার পাটাতন অপর এক অনুচর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। সে সংগীর অবস্থা দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেলো। সে এবার খুব শক্ত করে গলা টিপে ধরলো তরুণটার।

সে এক করুণ অবস্থার সৃষ্টি হলো।

তরুণটার জিভ বেরিয়ে এলো তার মুখের ভেতর থেকে।

বনহুর ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। সে নিজের প্রয়োজন বোধ করেনি এতক্ষণ। এবার বনহুর এগিয়ে এলো এবং নিজ অনুচরটার হাত দুখানা শক্ত করে ধরে ছাড়িয়ে দিলো।

তরুণ মুক্তি লাভ করলো কিন্তু সে আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়লো।

বনহুর যখন নিজ অনুচরটাকে সরিয়ে নিলো তখন মিস সোমা এ দৃশ্য দেখে অভিভূত হলো। কে এই ব্যক্তি যে এত মহৎ

বজরার তরুণদল নবীবক্ষে লাফিয়ে পড়ে জীবন রক্ষা করলো। সাঁতার কেটে সবাই বজরায় গিয়ে উঠলো।

বনহুরের অনুচরগণ ইচ্ছা করলে প্রায় বেশ কয়েকজনকে নিহত করতে পারতো, কিন্তু সর্দারের নির্দেশ নেই, একটাও যেন নিহত না হয়।

বনহুর এবার বললো–যাক, ওরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। পলাতককে হত্যা করা কাপুরুষের কাজ। এবার তোমরা বজরা নিয়ে আমাদের গন্তব্যস্থানের দিকে এগুতে থাকো ঐ বজরার কেউ আর আমাদের নাগালের মধ্যে থাকবে না।

অনুচরগণ বজরা চালিয়ে এগিয়ে চললো।

*

ফাংহা দ্বীপ।

নৌকাখানা পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত ফাংহা দ্বীপবাসী এসে হাজির হলো। তারা জানতে এমনিভাবে তাদের জন্য সাহায্য মাঝে মাঝে আসে। কে বা কারা সাহায্য নিয়ে হাজির হয় তা তারা জানে না।

কেউ ডালা নিয়ে, কেউ বস্তা নিয়ে এসেছে। কেউ এসেছে ঝুড়ি নিয়ে। বনহুরের অনুচরগণ নৌকা থেকে বস্তা নামিয়ে নিয়ে বিতরণ করে চলেছে।

সোমা নির্বাক, বিস্ময়ভরা চোখে সে নৌকায় বসে সব দেখছে। অনেক প্রশ্ন তার মনে জাগছে কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তর সে এখনও পায়নি। এরা কারা? কি এদের পরিচয়? কেন এরা এখানে খাদ্যদ্রব্য বহন করে এনেছে। কেননা কিছুই বুঝতে না পারলেও এটা মিস সোমা বুঝতে পারলো এরা জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী। এরা দুঃস্থ মানুষকে ভালবাসে। আর ভালবাসে বলেই এরা এসেছে দূরে অনেক দূরে এই ফাংহা দ্বীপে।

এক সময় খাদ্যদ্রব্য বিতরণ শেষ হলো।

ফাংহা দ্বীপবাসিগণের মুখে আনন্দের হাসি, তারা এবার পেট পুরে খেতে পাবে, ছেলেমেয়েদের মুখে খাবার তুলে দিতে পারবে। যা খাদ্যদ্রব্য পাবে তা দিয়ে বেশ কিছুদিন নির্বিঘ্নে চলে যাবে তাদের।

কাজ সমাধা করার পর বনহুর নৌকায় উঠে এলো। মিস সোমা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে, কে এই ব্যক্তি যার ব্যক্তিত্বের সীমা নেই।

অদ্ভুত নাক মুখ চোখ।

এত সুন্দর পৌরুষদীপ্ত মুখ সে পূর্বে দেখেনি। যতই ওকে দেখছে ততই সে অভিভূত হচ্ছে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো–মিস সোমা, এবার ফিরে যেতে হয়।

হাঁ। একটু থেমে বললো মিস সোমা–আপনার আচরণে মনে হয় আপনি নিশ্চয়ই মাঝি নন। কে আপনি যার সঙ্গে তুলনা হয় না কারও

হেসে বললো বনহুর–সব জানতে পারবেন। চলুন ফিরে চলুন, আপনাকে কান্দাই পৌঁছে দিয়ে তারপর নিশ্চিন্ত।

মিস সোমা বললো–আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনি শুধু আমার জীবন রক্ষাই করেননি, রক্ষা করেছেন মান সম্মান–ওরা আচ্ছা শায়েস্তা হয়েছে।

হাঁ, বেশ নাকানি চুবানি খেয়েছে ওরা।

ততক্ষণে অন্যান্য মাঝিবেশী অনুচরগণ জিনিসপত্রগুলো নৌকায় উঠিয়ে নিলো।

এবার নৌকা ছাড়লো ওদের।

বনহুর নৌকার ছৈয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো, হাত নাড়ছে।

সবার চোখেমুখে ব্যথাভরা ভাব, তারা বনহুরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছে। অনেকেই।

গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

নৌকাখানা ভেসে চলেছে।

তবু ওরা হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে।

মিস সোমা নৌকার ছৈয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো। যতক্ষণ মিস সোমা ছৈয়ের ভিতর ছিলো ততক্ষণ তার দৃষ্টি বনহুরকে

লক্ষ্য করছিলো।

মিস সোমা এসে দাঁড়াতেই বনহুর বললো–কেমন দেখলেন মিস সোমা?

অপূর্ব।

কি?

যতক্ষণ দেখছিলাম ততক্ষণ আমি মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। বড় ভাল লেগেছে আমার।

হাঁ মিস সোমা, ভাল লাগারই কথা। কারণ এরা বড় অসহায় এবং ক্ষুধার্ত। আমরা জানি না পৃথিবীর এমনি কত জায়গায় কত ক্ষুধার্ত মানুষ ধুকে ধুকে মরছে... যাদের জন্য কারো ভাববার সময় নেই... যাদের জন্য কেউ দুঃখ করে না বা করবার মত মনের ইচ্ছাও নেই ...

মিস সোমা বনহুরের কথাগুলো বিস্ময় নিয়ে শুনছিলো। এবার বলে উঠলো মিস সোমা—-আপনি কে আমি বুঝতে পেরেছি।

বনহুর ফিরে তাকালো সোমার মুখের দিকে।

মিস সোমার দুচোখে বিস্ময়।

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

বললো সোমা–আপনার পরিচয় আমি পেয়ে গেছি।

কেমন করে?

আপনার কার্যকলাপে।

তার মানে?

আমি কোনো জবাব দিতে পারবো না শুধু জেনে রাখুন আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। আপনিই আমাদের চিরবিস্ময় স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মিস সোমা!

হ্যাঁ, আমি ঠিক আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনার কার্যকলাপে আমি আপনাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। বলুন আমার কোনো ভুল হয়েছে।

বনহুর হেসে উঠলো অট্টহাসি।

মিস সোমা বললো–বলেছিলাম আপনি একজন অদ্ভুত মানুষ। বলুন আমার কথা ঠিক কিনা? আরও বলেছিলাম মাঝিবেশী হলেও আপনার চেহারাই আপনার পরিচয় বহন করছে।

আপনি এত দক্ষ তা জানতাম না।

এবার তো জানলেন?

হ্যাঁ। নিশ্চুপ থাকবেন।

আচ্ছা, কাউকে কিছু বলবো না তবে এক শর্তে।

বলুন?

কিন্তু....

বলুন থামলেন কেন?

আমার শর্ত আপনাকে মেনে নিতেই হবে।

যদি সম্ভবপর হয়।

তা জানি না তবে মেনে না নিলে...

কি করবেন?

সে কথা এখন বলতে চাই না।

পুলিশে ধরিয়ে দেবেন, এই তো?

না।

তবে?

আমি আর ফিরে যাবো না।

আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুর সোমার মুখের দিকে। মেয়েটা বলে কি সে আর ফিরে যাবে না। সে কি তাহলে তাদের সঙ্গেই থাকতে চায়। এটা কি সম্ভব? না, কিছুতেই সম্ভব নয়।

কি ভাবছেন?

কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছেন এবং একেবারে না বললে মিথ্যে বলা হবে। আমি জানি দস্যু বনহুর মিথ্যা বলে না, সত্য করে বলুনতে কি ভাবছিলেন?

বনহুর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলো আর ভাবছিলো এমন সুচতুরা মেয়ে হয় না।

বললো মিস সোমা!–আপনি ভাবছেন এমন সুচতুর মেয়ে তো আমি কখনও দেখিনি।

হাঁ, কতকটা তাই মিস সোমা। আপনি ভীষণ চালাক।

শুধু চালাকই নই, একেবারে নাছোড়বান্দা।

আপনাকে আমি এতক্ষণ বেশ শান্ত বলেই ভেবেছিলাম।

কিন্তু আমি বড় অশান্ত, তাই না?

শুধু অশান্ত নন, জেদীও বলবো।

জেনে রাখুন…

বলুন?

আমি শুধু জেদী নই একেবারে ভীষণ একরোখা। নাহলে অশ্বারোহী হিসেবে আজ ...

. এত খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না।

হাঁ, তাই জানেন আমার মা–বাবার মোটেই ইচ্ছা ছিলো না আমি নারী হয়ে অশ্বচালনা শিখি, তবুও যাক সে কথা। আমি যা চাই তাই আপনাকে করতে হবে।

বলুন আপনি কি চান?

আমি ভূমিকা করতে চাই না।

তাহলে বলে ফেলুন।

আপনার এ মহৎ কাজে আমি সঙ্গী হতে চাই।

বনহুর ভীষণ শব্দ করে হেসে উঠলো। তারপর হাসি থামিয়ে বললো– যা সম্ভব নয় তা কি করে হয় বলুন?

কেন সম্ভব নয়?

আপনি জানেন না কত কঠিন এ কাজ তাছাড়া জানেন তো আমার জীবন স্বাভাবিক নয়। সর্বদা পুলিশ আমার পিছু লেগে রয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে।

মিস সোমা বললো–বিপদকে আমি ভয় করি না। আপনার সঙ্গে আমাকে গেঁথে নিন। আমিও চাই দুর্গতদের সেবা করতে।

কিছুক্ষণ মৌন হয়ে কিছু ভাবলো বনহুর।

তারপর বললো–বেশ, যা চান তাই হবে। আপনার পিতা–মাতার কাছে ফিরে যান, সময় হলে আপনাকে ডেকে নেবো।

সত্যি কথা দিচ্ছেন?

হাঁ।

আমার ভাগ্য, আমি আপনার সাক্ষাৎলাভে সক্ষম হয়েছি। মনে মনে কল্পনা করেছি। আপনাকে, আমি ভাবতে পারিনি এমনভাবে সাক্ষাৎ পাবো আপনার।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো–হয়তো আমরাও ভাগ্য। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমি চেষ্টা করবো।

খুশি হলো মিস সোমা।

সারাটা দিন মিস সোমা বনহুরের সঙ্গে নানা কথাবার্তায় কাটিয়ে দিলো। যতই বনহুরের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করছে মিস সোমা ততই আশ্চর্য হচ্ছে, কারণ এমন লোক সে কোনদিন দেখেনি, যার মধ্যে নেই কোনো লোভ, লালসা, মোহ। নেই কোনো কুৎসিত অভিপ্রায় বা কুৎসিত মনোভাব।

পৌরুষ দীপ্ত বলিষ্ঠ পুরুষ বনহুর।

ওকে মিস সোমা দেখেনি কোনোদিন, কিন্তু ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই সে অনেকের মুখে শুনেছিলো। সে কাহিনী যেমন বিস্ময়কর ছিলো তেমনি ভীতিজনক। কিন্তু আজ সেই বনহুরকে সে এত কাছে পেয়েছে, এত ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলবার সুযোগ পেয়েছে, সব যেন কেমন এলোমলো হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস হচ্ছে না এই সেই বনহুর তাকে দেখবার জন্য শুধু কান্দাইবাসী নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আগ্রহী।

নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সোমা বনহুরকে পাশে ধরে রাখার চেষ্টা করলো এবং পেলও সে তাকে পাশে। কারণ নৌকা ছেড়ে তীরে নেমে যাবার পথ তো নেই, কাজেই বনহুর সোমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে চললো।

এক সময় নৌকা কান্দাইয়ের নিকট পৌঁছে গেলো।

শহরের মধ্যে পৌঁছার পূর্বেই নৌকাখানা নোঙর করলো বনহুর। তারপর সোমাকে লক্ষ্য করে বললো–কথা দিলাম মিস সোমা, আবার আমি আপনাকে কাজের সময় ডেকে নেবো।

মিস সোমা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললো– আমি তার প্রতীক্ষা করবো।

মিস সোমাকে বনহুরের অনুচরগণ পৌঁছে দিলো তার বাসায়।

বনহুর ভাবলো সত্যি মেয়েটার মধ্যে এমন একটি প্রতিভা আছে যা অনেকের মধ্যে নেই। ওকে দিয়ে অসহায় মানুষের অনেক উপকার করানো সম্ভব হবে।

বনহুর তো এমনি মানুষকে ভালবাসে, যে তাকে অন্তর দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবে।

বনহুরের দুজন অনুচর তাজসহ অপেক্ষা করছিলো ফাংহা দ্বীপ থেকে ফিরে এলে সর্দার তাজের পিঠে আরোহন করে তার গন্তব্যস্থানে যাবে। বনহুর নৌকা থেকে এবার তাজের পিঠে আরোহণ করলো, তারপর চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

*

কে?

আমি!

বড় নিষ্ঠুর তুমি!

আশা।

চলে গেলে, আর এলে না?

জানো খুব অসুবিধায় ছিলাম। ফাংহা দ্বীপে হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরছে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া গ্রাস করে ফেলেছে ঐ দ্বীপটা। তা ছাড়া কলেরা, বসন্ত নানা মহামারীতে আক্রান্ত তারা। এমন অবস্থায় আমি স্থির থাকতে পারি?

জানি, তুমি বিনা কারণে নিশ্চুপ ছিলে না।

বিশ্বাস করো আশা, তোমাকে কথা দিয়ে গেলাম, তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, আমি তোমাকে বিদেশ নিয়ে যাবো কিন্তু,....

না, আমি তা চাই না বনহুর। তুমি ফাংহা দ্বীপবাসীর ক্ষুধা দূর করার জন্য এবং তাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছে, এর চেয়ে আমাদের আর কি খুশি থাকতে পারে? তুমি যখন অবসর হবে, তখন আমাকে নিয়ে যেও।

আশা, আমি আর বেশি বিলম্ব করতে চাই না। তোমাকে নিয়ে যেতে চাই বিদেশে এবং তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। কিন্তু…

বলো বনহুর

শুধু ফাংহাদ্বীপ নয়, সমস্ত দেশে একটা দারুণ দূর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ একমুঠো অন্নের জন্য ধুকে ধুকে মরছে। পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, মুখে হাসি নেই…. সে কি করুণ অবস্থা।

সত্তরের মন্বন্তর নেমে এসেছে সারা দেশে…

হ, আমি কিছু কিছু শুনেছি বনহুর কিন্তু আমার করবার কিছু নেই।

কে বলে করবার কিছু নেই।

আমি বলছি, কারণ আমার দৃষ্টিশক্তি না থাকায় আমি…

তবু তোমার করবার অনেক আছে।

বল বনহুর?

তোমার সেই ভৌতিক গহ্বরে যে ধনরত্ন আছে, তা দিয়ে তুমি আজ এইসব দূর্গত মানুষকে সদ্য মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারো।

সত্যি পারি কিন্তু…

আমাকে দাও, আমি এসব ধনরত্ন বিলিয়ে দেই দেশের গরিব অসহায় মানুষদের মধ্যে। বলল আশা, তুমি রাজি।

রাজি। বনহুরের হাতের উপর হাত রাখলো আশা।

বললো বনহুর–তাহলে আমাকে বিদায় দাও আশা, ঐ মৃত্যুভয়াল ভৌতিক গহ্বরে প্রবেশ করি।

যাও, ফিরে এসো। ধন রত্ন যা প্রয়োজন তাই নিয়ে বিলিয়ে দাও অসহায় মানুষের মধ্যে কিন্তু…

বলো, থামলে কেন?

যদি কোনো বিপদ ঘটে?

তুমি তো জানো বিপদের সঙ্গে মোকাবেলা করাই আমার নেশা।

যাও বনহুর

বনহুর আশার দক্ষিণ হাতে গভীরভাবে একটা চুম্বন দিয়ে চাবি হাতে এগিয়ে গেলো সেই সিন্দুকটার দিকে।

খুলে ফেললো সিন্দুকের ডালা।

তারপর একটা সুইচ টিপতেই সিন্দুকের তলাটা একপাশে সরে গেলো। দেখা গেলো একটা সুড়ঙ্গ পথ।

বনহুর একবার আশার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গে।

চাপ চাপ অন্ধকার ভেদ করে সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করছিলো বনহুর। দক্ষিণ হাতে তার রিভলভার, কোমরের বেল্টে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

অন্ধকারে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলছে।

নেমে যাচ্ছে বনহুর সিঁড়ি বেয়ে।

কিছুটা নামতেই অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। বনহুর এই সুন্দর পরিবেশ অতিক্রম করে ভৌতিক গহ্বরের দিকে এগুলো।

ভৌতির গহ্বরে যে ধনসম্পদ বনহুর দেখেছে তা দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা যাবে। যার সন্ধান আশা নিজেও জানে না।

বনহুর মুখে মুখোশ পরে নিয়েছে।

জমকালো পোশাকে আচ্ছাদিত তার দেহ।

হাতে রিভলভার।

ভৌতিক গহ্বরের নিচে লাফিয়ে পড়লো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো সে।

[পরবর্তী বই ভৌতিক গহ্বরে মৃত্যুদূত]

বুকমার্ক করে রাখুন 0

Category: দস্যু বনহুর সমগ্র

পূর্ববর্তী:

« ৭.১৬ কুচক্রীর কবলে দস্যু বনহুর

পরবর্তী:

৭.১৭ রক্তপায়ী বাদুড় ও দস্যু বনহুর »